বাতায়ন

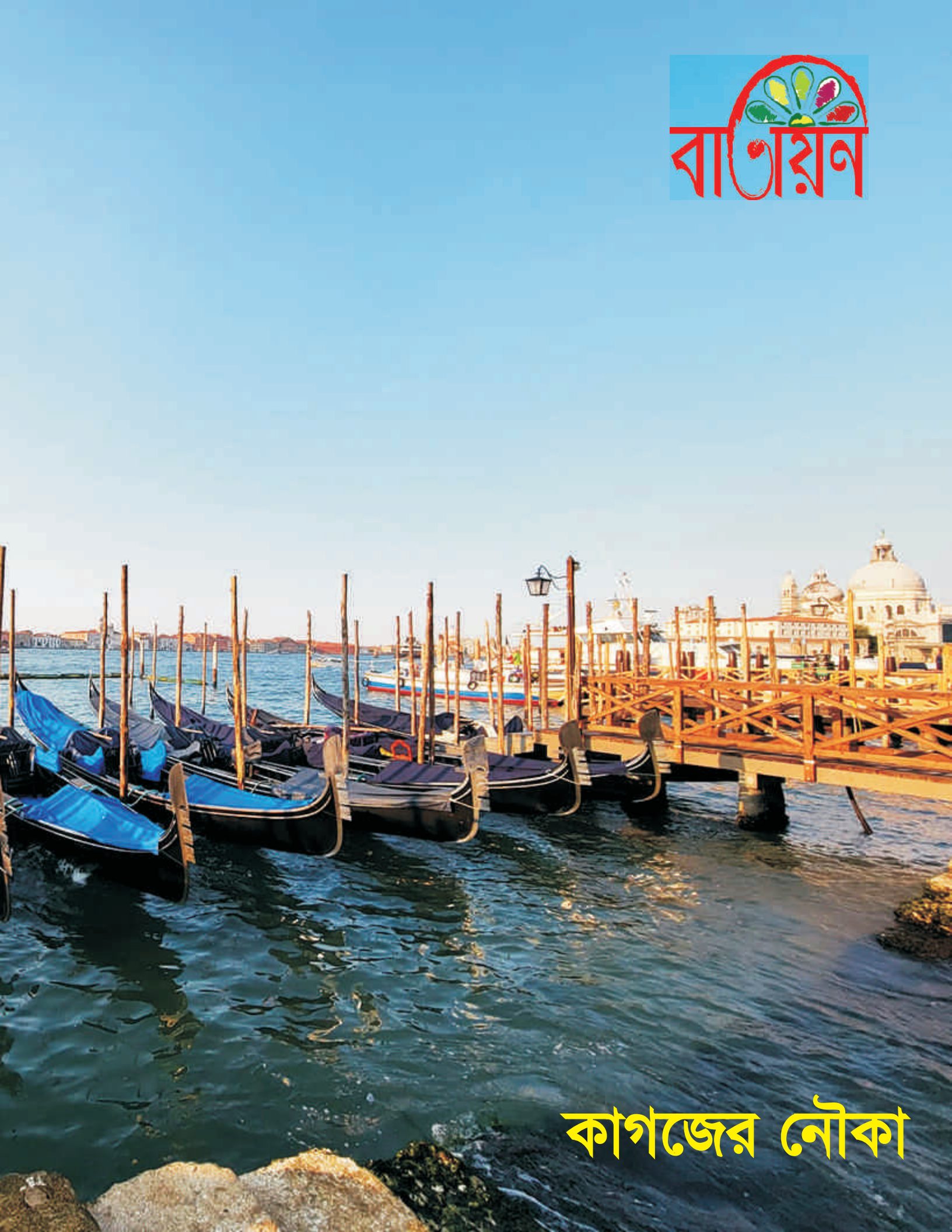

কাগজের নৌকা

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

২৪তম সংখ্যা, নভেম্বর ২০২৩

সম্পাদনা
সঞ্জয় চক্রবর্তী

Issue Number 24 : November, 2023

Editor
Sanjoy Chakraborty
Sydney

Group Editor
Ranjita Chattopadhyay
Chicago

Sub Editor
Sugandha Pramanik
Sydney

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata

Website Design and Support
Susanta Nandi, Kolkata

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Saumen Chattopadhyay
IL, USA

Front & Back Cover
Venice is pretty

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

Tirthankar Banerjee

Front Inside Cover
অস্ট্রেলিয়ার পার্থে বসন্ত

His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

Supriya Ghosh

Title Page
সোয়ান নদীর ধারে

Supriya Ghosh has a PhD in English and has been teaching Academic and General English, Writing and Editing, to international students for several years. Her objective is to provide enough English to her learners to enhance their social life and career goals. A keen observer of Natural beauty in its myriad forms, she holds an almost pantheistic awe of Nature. Lives in Perth, Australia.

Srijato

Back Inside Cover
অস্ট্রেলিয়া সফর ২০২৩

শ্রীজাত – কবি, গীতিকার, গদ্যকার ও চলচ্চিত্র পরিচালক। বাংলা ভাষার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবি। বাংলা আকাদেমি ও আনন্দ পুরস্কার সহ বহু পুরস্কারে সম্মানিত। দেশে বিদেশে বহু জায়গায় কবি হিসেবে আমন্ত্রিত।

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

"A ship in port is safe, but that's not what ships are built for", বলেছিলেন রিয়ার-অ্যাডমিরাল গ্রেস হপার, আমেরিকার নৌ-সেনা জগতের যিনি ছিলেন এক পরিচিত মুখ। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং COBOL যার হাত ধরে আসে সেই গ্রেস হপার আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তার এই উক্তি অমোঘ হয়ে রয়ে আছে আজও। নৌকার কাজ বন্দরে বন্দরে ঘোরা, নোঙর করে এক জায়গায় থাকা নয়। আর নয় বলেই ২৪তম কাগজের নৌকার সংখ্যা সময়ের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছলো পাঠকের মনের বন্দরে।

পুজো সদ্য শেষ, কিন্তু "যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো ?" উক্তির মতো ছুটির আমেজ রয়ে গেছে আপামর বাঙালির মনে। আর সবাই জানে বাঙালির ছুটি মানেই আড্ডা, গল্প ও অবশ্যই গল্পের বই বা ম্যাগাজিন। প্রতিবারের মতো এবারেও কাগজের নৌকা নিয়ে এসেছে দেশ বিদেশের লেখক লেখিকাদের কবিতা, গল্প ও উপন্যাস নিয়ে।

সদা হাস্যোজ্জ্বল গ্রেস ছিলেন নৌবাহিনীর অত্যন্ত জনপ্রিয় এক মানুষ। আশা রাখবো প্রতিবারের মতো এবারেও কাগজের নৌকা পাঠকের কাছে প্রিয় হয়ে থাকবে।

সঞ্জয় চক্রবর্তী
সিডনি
1-12-23

সূচীপত্র

ধারাবাহিক

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়	ছায়া সীমানা	8
সৌমিত্র চক্রবর্তী	সময়	21
স্বপ্না মিত্র	পাহাড় চুড়ো	33

কবিতা

দিধিতী চক্রবর্তী	কবিতাগুচ্ছ	5-7

গল্প

স্বর্ভানু সান্যাল	হাওয়ায় থাকুক হাওয়াই রেশ	46

দিধিতী চক্রবর্তী

কবিতাগুচ্ছ

বসন্তগান

কোকিলের গানে জনগন প্রাণে
বসন্ত খুঁজে পায়,
আমি তো শালিক কাকের ভিড়েও
বসন্ত গান গাই ...

বসন্ত ঝরে শ্রাবণের ঘরে
উষ্ণতা চায় শীতে,
বসন্ত বাজে মেঘমল্লারে
আদিম চর্যাগীতে।

শিমুল পলাশ মাস ভুল করে
এ বুকে ফুটতে চায়
বুক পেতে দিয়ে মুহূর্তে আমি
বসন্ত গান গাই ...

প্রিয় বুকে যেই মুখ রেখে ছুঁই
গহীনের সংসার,
ফিরে ফিরে আসে ঘন নিঃশ্বাসে
বসন্ত বার বার ...

কাঠফাটা রোদে দাঁড়ায় সে এসে
দখিনের জানালায়,
ভীষণ গ্রীষ্মে অনায়াস আমি
বসন্ত গান গাই ...

লালমাটি ছুঁলে যেকোনো বিকেলে
মহুয়ায় বুঁদ মন
জিগিজা ঘিজাং ঘিজাং নাচে
অকালের যৌবন ...

সমারোহে প্রিয় ঋতু মিশে যায়
বুকে পিঠে মজ্জায়
অফুরান আমি অনন্তে মিশে
বসন্ত গান গাই ....।

বই

কলম পুরুষ,
কাগজ নারী,
মগজ বন্ধ ঘর,
আদর আদর তুমুল আদর
সান্দ্র পরস্পর।
আখর পাশে খবর ভাসে
আসবে এবার সে,
ঘর বসাবে দুই মলাটে
উৎসবে উচ্ছ্বাসে ।
যাপনবেলা উদযাপনের
লগ্ন আসবে ঠিক,
জন্মকথা, জঠোর ব্যথা
তখন প্রাসঙ্গিক।

আলো

আমাকে বাঁধতে পারেনি ওরা,
তাই পুড়িয়েছে তিলে তিলে ...
আমাকে মুছতে পারেনি ওরা,
তাই পুড়িয়েছে তিলে তিলে,
আমাকে ভাঙতে পারেনি ওরা
তাই পুড়িয়েছে তিলে তিলে ...

আগুন দিয়েছে চোখে ...
আগুন দিয়েছে গায়ে ...
আগুন দিয়েছে মুখে ...
আগুন দিয়েছে পায়ে ...

আগুনের কাছে শিখেছি উর্ধমুখ
আগুনে মিলেছে কাঙ্খিত উত্তাপ,
পুড়তে পুড়তে পুড়েছে শঙ্কা, খেদ
আলোটুকু তার নিদারুন নিস্পাপ।

অর্থহীন

শবের পাশে সবই কেমন অর্থহীন!
শেয়ার বাজার, নিউজ পেপার, সেফটিপিন,
শবের পাশে সবই ভীষণ অর্থহীন।
ভাতের হাঁড়ি, মাসকাবারি, মুড়ির টিন,
ফার্নিশ ফ্ল্যাট, দক্ষিণে রোদ, ফলস সিলিং
পিএনপিসি, ই জেড সি সি, ব্যস্ত দিন ...
সেলেব রোয়াব, ফ্যান ফলোয়ারস, লেগ পুলিং
প্রত্যাখ্যান, প্রতিশ্রুতি অন্তহীন ...
উড়োচিঠি, মন্দ কথা, ফোনের রিং ...
যুদ্ধবিমান, শান্তির গান, বা পুতিন,
শবের পাশে সবই ভীষণ অর্থহীন।

ঘুমিয়ে থাকা একখানা মুখ কী কঠিন!
এক পৃথিবী হিসেব-নিকেশ অর্থহীন
শবের পাশে সবই কেমন অর্থহীন!

বন্ধুলোক

দেখব বলে দেখছে কে আর ?
অজান্তে চোখ আটকেছে।
পাশ কাটিয়ে হাঁটছি দূরে
দাঁড়িয়ে তবু খুব কাছে।

ছন্দ জীবন পতন ভীতু
চার চোখ তাও বন্ধুলোক,
মগজ বলছে সামলে বাঁচো
আত্মা বলছে বিপদ হোক।

জীবন বাবুর অঙ্ক খাতায়
মন আঁকছিল লাল গোলাপ
আমার শীতে মিশিয়ে দিও –
তোমার ভালবাসার তাপ।

ঘা

আগুন খাবে মেয়ে ?
বাড়িয়ে দিলুম হাত।
সে ভাবলে একি !
আসলে এই ধাত
নতুন কিছু নয়
শিশুকালের সই
ভালোবাসার দান
গ্রহণ তো করবোই।
দুহাত যেমন ঢালতে পারি
নিতেও পারি খুব।
ভালোবাসার আঙ্গুলগুলো
বড্ডো বেয়াকুব।
আগুন নাকি জল
কে আর বুঝছে তা
বুঝলে শুধুই ছ্যাকা
না বুঝলেই ঘা।

বসন্ত ছারখার

ইচ্ছে রে তোর পায়ে পড়ি
এবার আমায় ছাড়,
তোর গোয়ার্তুমির ফাঁদে পড়ে
বসন্ত ছারখার।
আগুন রঙা স্বপ্নে অমন
পোড়াসনি তুই আর ...
রে ইচ্ছে আমার ভীষণ রকম
ছুটির দরকার।
তুই যখন তখন প্রতিবাদী
যখন তখন শোক,
তুই কখন আবার নির্বিবাদী
জলে ভেজা চোখ,
তোর স্বেচ্ছাচারে জীবন জুড়ে
একশো একটা রোগ,
তোকে বুঝতে চেয়ে অবুঝপনার
মিলছে অভিযোগ।
তোর খামখেয়ালি ইশারাতে
খন্ড খন্ড রোজ,
শোন ঢের হয়েছে নাচন এবার
অন্য বাড়ি খোঁজ ...
এই ইঞ্চি তিনের বসত ঘরে
সবটা জুড়ে তুই,
আমি নিজের বুকেই যুদ্ধ করে
একটা কোণায় শুই।

I am **Didhiti Chakraborty**, a poet from Kolkata, West Bengal. I have completed MA in Bengali from Burdwan University. Also have some special works on Bankura's regional language. One of my poetry Books has been published from Day's Publication and another one is going to be published in book fair 2023. Many national and international magazines have published my poems several times. Got a opportunity to represent my country in 'Bangladesh National poetry festival' in Dhaka Bangladesh.

ধারাবাহিক উপন্যাস

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়া সীমানা

পর্ব ৫

(১০)

অতঃপর দেখতে দেখতে চারটে বছর কেটে গেল। সঞ্জয় তখন ইঞ্জিনিয়রিং-এ ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। মেলবর্ন ইউনির ভারতীয় এবং দক্ষিণ-প্রাচ্য ছাত্রদের পলিটিক্সে সক্রিয়ভাবে জড়িত সে। এদিকে গানবাজনাতেও খুব ঝোঁক তার। ভাল বাঁশী আর গীটার বাজাতে শিখেছে। ভারতীয় তরুণ ছাত্রদের মধ্যে এখন সে একজন মাতব্বর।

একদিন ইউনির ক্যাফেটেরিয়াতে বসে লাঞ্চ খেতে খেতে হঠাৎ কানে এলো বিবেক ধবনের পরিচিত গলা, "ইয়েস সী ইস্ আ বিউটি। আ রিয়েল বিউটি।" মুখ ফিরিয়ে সঞ্জয় দেখল, ওর দুটো টেবিল বাদ দিয়ে তৃতীয় টেবিলটা ঘিরে বসে আছে নীতীশ, সিদ্ধার্থ, বিনোদ আর শ্যামল। আর বিবেক তো আছেই প্রধান বক্তা হিসেবে।

– "হু ইস্ দ্য বিউটি, মে আই আস্ক?" সঞ্জয় কখন যে টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ওরা খেয়ালই করে নি।

– "কাম্, জয়েন অস্", নীতীশ বলল, "ওঁহা অকেলে বৈঠে কেয়া কর রহে হো?"

স্যান্ডউইচ আর কোকের বোতলটা তুলে ওদের টেবিলে চলে এলো সঞ্জয়। পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ঘন হয়ে বসে বলল, "ও. কে., হু ইস্ দ্য নিউ বিউটি অন্ ক্যাম্পস?"

সিদ্ধার্থ তরলকণ্ঠে বলল, "আরে তূ তো অভি তক্ বচ্চা হ্যায় রে। বিউটি-ফিউটি তো বড়দের ব্যাপার। নাই বা শুনলি।" সকলে হো হো করে হেসে উঠল সিদ্ধার্থর রসিকতায়। ওরা সকলেই সঞ্জয়ের চেয়ে খানিক বড়; ইঞ্জিনিয়রিং এবং মেটালার্জিতে পি. এইচ. ডি. করছে তখন।

দীপাবলি উৎসব আরও দু'মাস পরে। মেলবর্ন ইউনিভার্সিটির ভারতীয় ছাত্রদের যৌথ ক্লাব প্রস্তুতি নিচ্ছে নাচ, গান, কাওয়ালি, গজল, অন্তাক্ষরি ইত্যাদি দিয়ে দিওয়ালির উইকেন্ডের উৎসবটা জমজমাট করে তোলার। সঞ্জয়েরও ডাক পড়েছে একটা গ্রুপ পারফর্মেন্সে গানের সঙ্গে বাঁশী বাজাতে। আর ভাংড়া নাচের গ্রুপেও ওকে আসতে হয়েছে সিদ্ধার্থ-নীতীশের পীড়াপীড়িতে। দীপাবলির মাস দুয়েক আগে থেকে প্রতি শুক্র-শনি-রবিবার সন্ধ্যা থেকে জোর রিহর্সল আরম্ভ হল ছাত্রদের ভাড়া করা একটা কমিউনিটি হলে।

সঞ্জয় যেদিন প্রথম রিহর্সলে গেল সেদিনই ঘটল অঘটনটা। বাঁশী হাতে, শিষ দিতে দিতে কমিউনিটি সেন্টারের লম্বা প্যাসেজটা পেরোচ্ছে সঞ্জয়, বিপরীত দিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসা একটা মেয়ের সঙ্গে লাগল আচমকা ধাক্কা। সঞ্জয়ের হাত থেকে বাঁশীটা ছিটকে পড়ে গেল একটু দূরে মস্ত ক্যামেলিয়া গাছের নীচে। সেই সঙ্গে, মেয়েটার বুকের কাছে আঁকড়ে রাখা এক রাশ কাগজপত্র, বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল বারান্দার ওপর।

– "উপ্স্," বলে মেয়েটা বারান্দার মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে কাগজপত্র তুলতে তুলতে বলল, "সরি"।

ছিটকে বেরিয়ে যাওয়া বাঁশীর কথা ভুলে গিয়ে সঞ্জয়ও ওর মুখোমুখি, উবু হয়ে বসে ওর কাগজপত্র কুড়োতে কুড়োতে বলল, "সরি"।

চোখাচোখি হল দুজনের। সঞ্জয়ের মনে হল, আগে কোথাও একে দেখেছি না! খুব চেনা চেনা! মেয়েটা বিস্ফারিত

চোখে, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়া অবাধ্য চুলের গোছাটাকে সরিয়ে বলল, "আর ইউ নট্ সঞ্জয় মুখার্জী?" স্তম্ভিত হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল সঞ্জয়। মেয়েটি একগাল হেসে বলল, "আমি শর্মিলা বসু"। তারপরে নিঃসঙ্কোচে, অবলীলা ক্রমে ডান চোখ মেরে বলল, "রিমেম্বর মী"?

– কি আশ্চর্য! তুমি এখানে ?

– "মনে পড়ল তাহলে ?" কাগজপত্র তুলে নিয়ে দুজনেই উঠে দাঁড়াল। হাতে ধরা কাগজগুলো শর্মিলার হাতে তুলে দিতে দিতে সঞ্জয় আবার বলল, "কি আশ্চর্য !"

– কেন, আশ্চর্য কেন ?

– তুমি হঠাৎ এখানে ? কি করছ ?

– তুমি যা করছ, আমিও তাই। পড়াশোনা।

– কি পড়ছ তুমি ?

– আমিও এখন মেলবর্ন ইউনির ছাত্রী, বুঝেছ ? কিড্নী ডিজীস এরিয়াতে স্টেম্ সেল্ অ্যাপ্লিকেশন এর ওপর পি. এইচ. ডি. করছি। তুমি ?

– ইঞ্জিনিয়রিং-এর ফাইনাল ইয়ার।

– তুমি তো অনেক বড় হয়ে গিয়েছ দেখছি। চার বছর আগের সেই ছোট্ট, ভীতু, মুখচোরা খোকাবাবুটি আর নও তুমি !

ছোট্ট! ভীতু! মুখচোরা! খোকাবাবু! অতগুলো বিশেষণ নিঃশব্দে হজম করতে হল সঞ্জয়কে।

শর্মিলা এবার একছুটে বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে গাছের তলা থেকে বাঁশীটা কুড়িয়ে এনে ওর হাতে দিয়ে বলল, "নাও, ধরো।"

ঠিক সেই সময়ে, লম্বা কংক্রীটের বারান্দার অপর প্রান্তে, একটা দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে সঞ্জয়কে দেখতে পেয়ে নীতীশ বলে উঠল, "দেয়র ইউ আর! কি করছ বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ! রিহর্সল তো আরম্ভ হয়ে গেছে।"

অপ্রস্তুত হয়ে সঞ্জয় তাড়াতাড়ি জালির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কমিউনিটি হলের একটা ঘরে কয়েকটা ছেলেমেয়ে মিলে তখন পুরোদমে ভাঙড়া নাচ প্র্যাক্টিস্ করছে টেপের মিউজিকের সঙ্গে। এদের সঙ্গে আপাততঃ সঞ্জয়কে যোগ দিতে হবে। ওর নাচের পার্টনারের নাম রীতা শর্মা।

বেশ কয়েক উইকএন্ড ধরে প্রাণপণ রিহার্সালের পর অবশেষে ভারতীয় ছাত্রসংঘের আলোর উৎসব খুব সুন্দরভাবে উৎরে গেল মেলবর্ন ইউনিভর্সিটির ইউনিয়ন হলে। ভাঙড়া নাচ ছাড়াও ছিল, বলিউড নাচগান, ভারতীয় লোকনৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন। সঞ্জয় বাঁশী বাজিয়েছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে আর গীটারে বাজিয়েছিল হিন্দী ফিল্মী গান। বলিউড নাচ ও ফোক-ডান্সের দলে শর্মিলাও ছিল।

উৎসবের পর খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্তও ছিল। শর্মিলা এক ফাঁকে ওকে একলা পেয়ে বলল, "তোমার বাঁশী আর গীটার বাজানো দুটোই দারুণ হয়েছিল। কন্গ্র্যাট্স্। কিন্তু তোমার ভাঙড়া নাচ! না দেখলে কল্পনাই করতে পারতাম না যে তুমি অমন লাফিয়ে লাফিয়ে ভাঙড়া নাচতে পারো। আবার পার্টনারটিও গর্জস্ – বলিউডি হিরোইনদের মত", বলতে বলতে হি হি করে হাসছিল শর্মিলা।

নানাবর্ণের একরাশ বাজী পোড়ানোর পরে অনুষ্ঠানপর্ব চুকতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। তাই সিদ্ধার্থ ওকে ইন্টারন্যাশনাল হাউসে নামিয়ে দেবার প্রস্তাবে খুশীমনে রাজী হয়ে গিয়েছিল সঞ্জয়।

– "কখনো বলিস নি তো যে বিউটি কুইনকে তুই চিনিস!" গাড়ি চালাতে চালাতে সিদ্ধার্থ বলেছিল।

– "বিউটি কুইন! সে আবার কে?" চমকিত হয়েছিল সঞ্জয়।

– "ন্যাকামো করিস না", সিদ্ধার্থ অধৈর্য গলায় বলেছিল।

– তুই কি রীতা শর্মার কথা বলছিস ?

– না ভাইয়া, না। আমি বলছি শর্মিলা বোসের কথা। আমাদের নতুন আসা বিউটি কুইন, শর্মিলা বোস!

– "সে কি! শর্মিলা তোদের বিউটি কুইন!" আকাশ থেকে পড়েছিল সঞ্জয়।

– অ্যাব্সোলিউট্লি! অবশ্যই! আমাদের ইউনীর ভারতীয় ছেলেরা এ বিষয়ে একমত। সী ইস্ আওয়ার বিউটি কুইন।

– আমি ভাবছিলাম, বোধ হয় রীতা শর্মা –

– "দুর, দুর! ফাল্তু বকিস না তো! কোথায় রীতা শর্মা বলিউডি পুতুল আর কোথায় শর্মিলা বোস দ্য প্রিন্সেস্। কেয়া পার্সোন্যালিটি হ্যায় জনাব কা", বলতে বলতে ওর দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে অবজ্ঞাভরে বলল সিদ্ধার্থ, "যাক্ গে! তুই বুঝবি না। তোর মনটা এখনো বাচ্চাদের মতনই আছে। বড় হোস্ নি এখনো!" কয়েক সেকেন্ড পরে, সে আবার মুচ্কি হেসে বলল, "অবশ্য তুই বড় হোস নি তাতে আমাদেরই লাভ। শর্মিলা বসুর হবু প্রেমিকদের লাইনে অন্ততঃ একজন লেস্ প্রতিদ্বন্দ্বী"।

সে রাতে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম আসে নি সঞ্জয়ের। রীতা শর্মা না, শর্মিলাই বারংবার ভেসে আসছিল বিনিদ্র দুই চোখের সামনে। ওর মনে হয়েছিল যে সিদ্ধার্থর কথাই ঠিক। মেয়েটাকে তার ব্যক্তিত্ব এক অসাধারণ আকর্ষণীয় দীপ্তিতে ঘিরে রেখেছে আর অগ্নিশিখার মত তার সেই রূপই পতঙ্গদের অনবরত আকর্ষণ করে চলেছে ওর দিকে। মনে মনে স্বীকার করেছিল সঞ্জয়।

মাসখানেক পর এক সন্ধ্যায় সমরেশদার ফোন এল। সমরেশদা আর বৌদি, তাঁদের বন্ধুদের নিয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেন প্রতি বছর মে মাসে। সেই অনুষ্ঠানের তোড়জোড় আর রিহর্সলেই কেটে যাবে আগামী কয়েক মাস। প্রতি শুক্র, শনি এবং রবিবার সন্ধ্যে থেকে মহড়া দিতে গায়ক, বাদক ও আবৃত্তিকারদের হাজিরা দিতে হবে সমরেশদার বাড়িতে। তারপর বৌদির হাতে রাঁধা দারুণ সুস্বাদু ডিনার সেরে রাত এগারোটা নাগাদ সবার বাড়ি ফেরা। সকলের জন্যই মস্ত কমিটমেন্ট।

– অ্যাই সঞ্জয়, আসছে শুক্রবার থেকে আমার বাড়ি রিহর্সল আরম্ভ হচ্ছে, মনে আছে তো?

– আছে সমরেশদা, কিন্তু –

– কোন কিন্তু আমি শুনতেই চাই না। তোকে শর্মিলা ওর গাড়িতে লিফ্ট দেবে – টু অ্যান্ড ফ্রো। কথা হয়ে গেছে আমার সঙ্গে।

– শর্মিলা!

– হ্যাঁ! শর্মিলা বোস। তোদের অর্মন্ড কলেজের কাছেই পার্কভিলে একটা টেরেস হাউসে থাকে। অঞ্চলটা সঞ্জয় খুব ভালই চেনে। দেখা গেল শর্মিলারা কয়েকজন মিলে যে বাড়িটা শেয়ার করছে, সেটা সঞ্জয়দের কলেজ থেকে হাঁটা পথে। সুতরাং রিহর্সলের দিনগুলোতে সঞ্জয় হেঁটেই চলে যেত শর্মিলাদের বাড়ি আর সেখান থেকে শর্মিলার হন্ডা সিভিকে চেপে ওরা যেত সমরেশদার বাড়ি।

রিহর্সল আরম্ভ হবার সপ্তাহ তিনেক পর আইলীন সীবর্নের ফোন এল।

– হ্যালো ইয়ং ম্যান, শুনছি নাকি তোমার গর্ল ফ্রেন্ড হয়েছে? ইস্ দিস্ হোয়াই আই ডোন্ট সী মচ্ অফ্ ইউ দীস্ ডেস্"।

বিষম খেয়ে কাশতে কাশতে সঞ্জয় বলেছিল, "নো মম্ নট্ অ্যাট্ অল্। কে তোমাকে বলল এসব ?"

– "কে বলল দ্যাট্স্ নট্ ইম্পর্টেন্ট। যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হল, আই উড লাইক টু মীট হার।"

– অ্যাব্সোলিউট্লি। একদিন শর্মিলাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাব।

– "গুড। কাম ফর ডিনার ওয়ান ইভনিং", বলে মাম্ লাইন কেটে দিয়েছিল।

আইলীন সীবর্নের সঙ্গে কথা বলার পর ভাবতে বসেছিল সঞ্জয়। শর্মিলার সঙ্গে গানের রিহর্সলে যাওয়া-আসা এবং একসঙ্গে গান-বাজনায় মেতে থাকার দরুন কিছুটা ঘনিষ্ঠতা তার সঙ্গে হয়েছে সঞ্জয়ের। কিন্তু সত্যিই কি শর্মিলা ওর গর্ল ফ্রেন্ড! হদিশ পায় নি সে।

অবশেষে রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানের পর, দু-তিনটে রিক্ততায় ভরা উইকেন্ড কাটিয়ে সঞ্জয়কে মনে মনে স্বীকার করতে হল, শর্মিলার সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে দেখা, মেলামেশা এবং গাড়িতে তার সান্নিধ্য – সব কটার অভাব সে খুব বেশী করে টের পাচ্ছে।

দিনকতক পরে এক সন্ধ্যায় সে শর্মিলার বাড়ি গিয়ে হাজির হল। পালা করে রান্না করে শর্মিলারা। সে তখন মন দিয়ে রান্না করছিল ওর ফ্ল্যাটের তিন সঙ্গিনীর জন্য। সঞ্জয়কে আচম্কা বিনা নোটিশে আসতে দেখে আশ্চর্য হল। বলল, "আরে কি ব্যাপার? এসো, এসো। হঠাৎ ?"

– "হঠাৎ তোমার কথা মনে হল, তাই –" লাজুক মুখে বলল সঞ্জয়।

– "ভালই করেছ এসে। ব'সো, ওই টুলটায় ব'সো –" অদূরে একটা কাঠের টুল দেখাল শর্মিলা, "চা খাবে? বা কফি?"

– নাঃ! ওসব কিছুই খাই না আমি।

– তবে? ড্রিংকিং চকোলেট চলবে? ইন্টারেস্টেড?

– নাঃ! আমি আসলে তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি।

– "জিনিস? কেন ?" আশ্চর্য হয়েছিল শর্মিলা।

– ব্রডওয়ে শো'র টিকিট – মাই ফেয়ার লেডি। আগামী শনিবার সন্ধ্যায়। আমরা দুজন যাব।

– "মাই ফেয়ার লেডি! বাঃ! দ্যাট্ উইল বী গ্রেট" শর্মিলা খুশী হয়ে বলল, "ঠিক আছে, চলো যাই।"

সেই শনিবার সন্ধ্যেটা খুব ভাল কাটলো ওদের। ডাউনটাউনে ইতালিয়ন রেস্তোঁরাতে ইতালিয়ন ওয়াইন সহযোগে ডিনার খেয়ে, মিউজিকাল দেখে বেশ রাত করেই ফিরে এলো ওরা শর্মিলার গাড়িতে।

একটু একটু করে শর্মিলা আর সঞ্জয়ের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল। যে কোন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঞ্জয় তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার অভ্যেস করে ফেলল।

দুজনের বন্ধুমহলে সঞ্জয় আর শর্মিলা "আইটেম" বলে অভিহিত হল অতঃপর।

আইলীন সীবর্নের বাড়িও গিয়েছিল ওরা এক সন্ধ্যায় ডিনারের আমন্ত্রণে। আইলীন শর্মিলার সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। সুন্দর করে সাজানো খাবার টেবিলে চমৎকার ফাইভ-কোর্স ডিনার পরিবেশন করেছিলেন। ভারি উপভোগ্য ছিল সেই সন্ধ্যেটা।

পরদিন সকালে সঞ্জয় ফোন করেছিল ফ্রেড সীবর্নকে। গতরাত্রের আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বলেছিল, "কালকের সন্ধ্যেটা আমরা দুজনে খুব উপভোগ করেছি, ড্যাড। ইট্ ওয়াজ আ পর্ফেক্ট ইভ্‌নিং"।

সে কথার উত্তর না দিয়ে ফ্রেড সীবর্ন বলেছিলেন, "স্যান-জয়, ইজ সী রিয়েলি ইওর গর্ল ফ্রেন্ড? ডু ইউ লভ্ হর"?

আচম্‌কা প্রশ্নটা শুনে থতমত খেয়েছিল সঞ্জয়, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, "ইয়েস ড্যাড। আই লভ্ হর ভেরি মচ্। বট্ হোয়াট ডু ইয়ু থিংক অফ্ হর ? ওকে তোমাদের কেমন লাগল"?

– "পার্ডন মী ফর সেয়িং সো, বট্ উই ডিড নট্ থিংক সী ওয়াজ ইওর টাইপ, মাই বয়। স্পষ্ট কথা বলছি বলে মার্জনা কোরো। ওই মেয়ের সঙ্গে তোমার মিলমিশ হবে বলে আমাদের মনে হয় না। তোমরা দুজনে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির"।

কথাটা শুনে সঞ্জয় ক্ষুণ্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকাশ করে নি।

ফাইনাল পরীক্ষার পর এক উইকেন্ডে জর্জের সঙ্গে সঞ্জয় আর শর্মিলা ক্যাম্পিং করতে গিয়েছিল উইলসন্‌স্ প্রমে। তখন এক সময়ে সঞ্জয়কে একান্তে ডেকে জর্জ প্রশ্ন করেছিল, এই মেয়েটি কি তোমার গর্ল ফ্রেন্ড? তুমি ভালবাসো একে?

এবার নির্দ্বিধায় সঞ্জয় বলেছিল, "হ্যাঁ"।

– ও।

– তোমার কেমন লাগছে শর্মিলাকে? ইস্‌ন্ট সী গর্জস্, জর্জ?

মুচ্‌কি হেসে জর্জ বলেছিল, "হ্যাঁ, মন্দ কি! ভালই। তবে একটু ভেবেচিন্তে এগিও"।

– মানে ?

– না, এমন কিছু না। অ্যাস্ লং অ্যাস্ ইওর রিলেশনসিপ ইস্ সিন্‌সিয়র অ্যান্ড অনেস্ট। খেয়াল রেখো কথাটা যাতে পরে মনস্তাপ করতে না হয়।

বাইশ বছরের সঞ্জয়ের তখন ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠেছিল শর্মিলা। মনেপ্রাণে অনুভব করছে ভালবাসার মায়ামুগ্ধ, উষ্ণ স্পন্দন। প্রেম যে একজনকে এমনভাবে মোহজালে আবিষ্ট করতে পারে, এমনভাবে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলতে পারে, এমন এক ম্যাজিকল স্টেটে নিয়ে যেতে পারে, কোনদিন কল্পনা করতে পারে নি সে। শর্মিলার হাত ধরে যেন আকাশে, মেঘের আস্তরণগুলোর ওপর হেঁটে চলেছিল সঞ্জয়।

ইঞ্জিনিয়রিং ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোল অবশেষে। অসাধারণ কৃতিত্বের সাথেই পাশ করেছিল সঞ্জয়।

সেলিব্রেট করতে বেরিয়ে পড়েছিল ওরা দুজন – ড্যান্‌ডিনং পাহাড়ের ওপরে এক নিরিবিলি রেস্তোঁরায়।

– "সত্যি, তুমি দেখালে বটে", শ্যাম্‌পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে শর্মিলা বলেছিল, "এত হুড়োহুড়ি, ছুটোছুটি, মাতামাতির পরেও কি করে এমন অসাধারণ রেজাল্ট করতে পারলে সঞ্জয়? ইউ আর অ্যামেসিং"।

– তাই তো! আই গেস্ তোমার সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠতাই প্রেরণা দিয়েছে আমায় নিজেকে তোমার যোগ্য প্রমাণ করার।

– "আমার যোগ্য"! ধনুকের মত আঁকা ভুরুজোড়া কুঁচকে বলেছিল শর্মিলা।

– "হ্যাঁ, আমি নিজেকে তোমার যোগ্য করে তুলবই। আজ আমি প্রতিজ্ঞা করছি। এবার আমি পি. এইচ. ডি. তে এন্‌রোল করব। দেখবে, কয়েক বছরের মধ্যেই আই উইল বী নোন অ্যাস্ ডঃ সঞ্জয় রয়"।

– ও, তাই। তোমার মাথায় এসব বুদ্ধি কে ঢোকাচ্ছে বল তো? যোগ্য – অযোগ্য – যত্তো সব ফাল্‌তু চিন্তা!

– "না, ফাল্‌তু না", অধীর হয়ে বলেছিল সঞ্জয়, "শর্মি, আজ তোমার কাছে একটা আব্দার করব, দিতেই হবে তোমাকে।"

– আব্দার!

– আমার আব্দার রাখবে তুমি, বলো।

– "নিশ্চয়ই শুনব। আজ তোমার স্পেশল দিন। যা চাইবে আমার কাছে, তাই পাবে"।

ওদের দুজনকার খালি হয়ে যাওয়া শ্যাম্‌পেনের গ্লাস ভরে দিয়ে গিয়েছিল ওয়েটর।

– আমাকে বিয়ে করবে শর্মি?

বিয়ে! এই প্রস্তাবটা যে শীঘ্রই একদিন সঞ্জয়ের কাছ থেকে আসবে, জানত শর্মি। কিন্তু তাও চম্‌কে উঠে বলল, "বিয়ে! ও মাই গড! বিয়ের কথা ত' ভাবি নি"।

– প্লীজ, এবার ভাবো। আমি তোমাকে খুব, খুব ভালবাসি। আমি জানি তুমিও আমাকে –

– "আমাদের একটু ভাবতে হবে, সঞ্জয়", হাত তুলে বাধা দিল শর্মিলা, "এখুনি শ্যাম্‌পেনের ঘোরে এমন কিছু কমিট করা উচিত হবে না যার জন্য পরে পস্তাতে হয়। চলো, এবার ওঠা যাক্"।

– শর্মি, আমি জানি তুমি বিশাল ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী পরিবারের মেয়ে। আদরের দুলালী। এখন, এই মুহূর্তে আমি অবশ্যই তোমাদের পরিবারের উপযুক্ত নই। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে আমি ধনে, মানে তোমার স্তরে উঠে আসব, দেখে নিও তুমি।

সাত দিনের মাথায়, সঞ্জয়কে ফোন করল শর্মিলা, "আজ সন্ধ্যায় আমার ফ্ল্যাটের বন্ধুরা কেউ বাড়ি নেই। আমি একা। এসো না, একসঙ্গে ডিনার করি, সঞ্জয়"।

– "আসতে পারি যদি তুমি আমার প্রস্তাবের উত্তরটা আজ দাও। জানো, আজকাল আমি একটুও ঘুমোতে পারি না। ছট্‌ফট্ করি প্রতিটি মুহূর্ত। কি অসম্ভব মানসিক চাপে আছি আমি, তুমি কি একটুও আন্দাজ করতে পারো, শর্মি?"

– ও.কে. বাবা, ও.কে. । তুমি চলে তো এসো ।

আধ ঘন্টার মধ্যে শর্মিলাদের টেরেস হাউসে গিয়ে হাজির হয়েছিল সঞ্জয় । আশা, আকাঙ্খা আর স্বপ্নের বিলাসিতায় বুক বেঁধে । এক্কেবারে ফাঁকা বাড়িতে, নীচে কমন রান্না-খাওয়ার স্পেসে বসে, শর্মিলার রান্না করা চিলি চিকেন আর ফ্রায়েড রাইস খেতে খেতে অনেক গল্প করেছিল ওরা । ভবিষ্যতে নিজের নিজের কেরিয়র গড়ে নিতে কে কোন্ দিকে এগিয়ে যাবে তার নানা প্ল্যান । ডিনারের পর, এক সময়ে ওপরতলায় শর্মিলার ঘরে চলে এসেছিল দুজনে । ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানার ওপর বসেছিল শর্মিলা । সঞ্জয় পড়ার টেবিলের পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসেছিল ।

– "এবার বলো, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?" অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করেছিল সঞ্জয় ।

খুব জোরে হেসে উঠে শর্মিলা বলেছিল, "কি করে তোমাকে বিয়ে করি বলো, সঞ্জয়! এই ক'মাসে আমরা কি একটুও ঘনিষ্ঠ হতে পারলাম? তুমি দূরে দূরেই থেকে গেলে আমার ।"

– "আমরা ঘনিষ্ঠ হই নি?" খুব আশ্চর্য হয়েছিল সঞ্জয় ।

– "ঘনিষ্ঠ"? বড় বড় চোখে সকৌতূকে ওর দিকে চেয়ে শর্মিলা বলেছিল, "ঘনিষ্ঠতা মানে যদি হাত ধরাধরি করে পার্কে ঘুরে বেড়ানো হয়, একসঙ্গে সিনেমা-থিয়েটার-রেস্তোঁরায় যাওয়া হয়, উপহার দেওয়া-নেওয়া হয়, ক্যাম্পিং করা হয়, মাঝে মাঝে কপালে একটা চুমু খেয়ে স্বর্গীয় আনন্দলাভ করা হয় – তাহলে হ্যাঁ, আমরা নিশ্চয় খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছি । কিন্তু আসলে কি সেটা ঘনিষ্ঠতা, সত্যি-সত্যিই ?

– নয় ?

– "না", দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল শর্মিলা, "ঘনিষ্ঠতার অর্থ শুধু মনেরই নয়, দেহেরও ঘনিষ্ঠতা । প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের মন জানাজানির সঙ্গে, তাদের দুটো শরীরেরও একে অন্যকে চেনা এবং ভালবাসা" ।

– "দৈহিক ঘনিষ্ঠতা"! বিমূঢ় হয়ে সঞ্জয় বলেছিল, "আই ওয়াস্ সেভিং ইট্ অল্ ফর ম্যারেজ ।"

– "কোন্ যুগে বাস করো তুমি, সঞ্জয়? দেহের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে প্রেম কোথায় থাকে বল্‌তে পারো"? একটু থেমে আবার বলেছিল, "আসলে তোমার-আমার সম্পর্কটা বন্ধুত্বের । ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমরা – কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা আদৌ প্রেমিক-প্রেমিকার নয় । উই আর নট্ লাভার্স" ।

– "বন্ধু! প্রেম নয়"! অস্ফুটে উচ্চারণ করেছিল সঞ্জয় ।

– "ঠিক তাই" । শর্মিলা জোর দিয়ে বলেছিল, "আর তাছাড়া –"

– তা ছাড়া ?

– তুমি আমার চেয়ে পাক্কা চার বছরের ছোট । তোমাকে হাস্‌বেন্ড বলে কি করে মেনে নিই বল ।

– কেন ! বয়সে একটু বড় হলেই বা কি, শর্মি । আমরা, বাঙালিরা ছাড়া ভারতে আর অন্য কোন স্টেট স্বামী-স্ত্রীর বয়সে তারতম্য নিয়ে মাথা ঘামায় না । স্ত্রীকে যে স্বামীর চেয়ে ছোট হতেই হবে এমন কোন নিয়মও নেই । তবে ?

– কিন্তু আমি বিশ্বাস করি । বিবাহিত রিলেশনশিপে, স্ত্রীর অবশ্যই স্বামীর চেয়ে ছোট হওয়া উচিত । কারণ মেয়েরা পুরুষদের অনেক আগেই বুড়িয়ে যায় । "তুমি-আমি যদি সত্যিই বিয়ে করি, কিছু বছর পরে ইউ উইল বী ম্যাচ্‌ড্ উইথ অ্যান ওল্ড উওমন, অ্যান্ড ইউ উইল নট্ লাইক দ্যাট ওয়ান বিট", তরল কণ্ঠে বলেছিল শর্মিলা, "না সঞ্জয়, কখনোই আমাদের বিয়ে সম্ভব না । লেট্‌স্ রিমেন গুড ফ্রেন্ড্‌স্ ফর এভার" ।

সঞ্জয় কতক্ষণ বসেছিল এরপর, স্তব্ধ, নির্বাক।

সেই প্রস্তরমূর্তির দিকে চেয়ে অবশেষে বুঝি মায়া হয়েছিল শর্মিলার। বিছানা থেকে নেমে এসে ওর কাছে দাঁড়িয়ে ওর মুখটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিল, "সঞ্জয়, তুমি কোলকাতা ফিরে গিয়ে খুব সুন্দর একটা মেয়েকে বিয়ে কোরো। তোমার মায়ের পছন্দ করা মেয়েকে। যে হবে বয়সে তোমার চেয়ে অন্ততঃ চার-পাঁচ বছরের ছোট"।

ওকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠেছিল সঞ্জয়।

* * * * *

গরম কফির পেয়ালা আর টোস্ট নিয়ে এসে ওর বিছানার পাশে টেবিলের ওপর রাখলেন আইলীন সীবর্ন।

জর্জ বসেছিল একটা চেয়ার নিয়ে, ওর বিছানা ঘেঁসে। আইলীনকে দেখে বলল, একটু ইম্প্রুভ করেছে ডেফিনিট্‌লী। অন্ততঃ আমাদের দিকে চেয়ে আছে পরিষ্কার চোখে। দৃষ্টি ঘোলাটে নয়। ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন মিসেস সীবর্ন।

– "স্যান-জয়, হাউ ডু ইউ ফীল?" ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল জর্জ হিল।

– "আমি কোথায় ?" চারিদিকে চোখ বোলাল সঞ্জয়, "কোথায় আমি ?"

– "ইউ আর ইন্ হস্‌পিটল্, মাই সন", কোমলকণ্ঠে বললেন মিসেস সীবর্ন, "ইউ আর জস্ট্ কমিং আউট অফ্ আ ডীপ স্লিপ।"

– স্লীপ! স্লীপ!" ধীরে ধীরে বলল সঞ্জয়। ওর চোখ দুটো আমেজে বুজে এলো আবার, "আঃ! কি শান্তি"।

চোখ বুজে মনে করতে লাগল সঞ্জয়। সেই রাতে শর্মিলার বাড়ি থেকে বেরিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিল সঞ্জয়। নির্মম আঘাতে অসাড় হয়ে যাওয়া মন বলছিল, কোথায় যাবে এবার ? জীবনের সব মানেই ত' হারিয়ে গেল। লক্ষহীন এই জীবনটাকে আর টানারই বা কি দরকার ! মান, সম্মান, ইগো, সব কিছুই হারিয়ে ফেলেছে সে, শর্মিলার "না" উচ্চারণের সঙ্গে। এক ফুঁয়ে যেন ওর জীবনের বাতিটা নিভে গেল – এমনটাই, মনে হয়েছিল সঞ্জয়ের। অতঃপর সারা রাত কেটেছিল ঘরের মধ্যে পায়চারি করে। পরের সারাটা দিনও ঐভাবেই কেটে গেল। তৃতীয় দিনে অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হল ওর মাথার মধ্যে। চারিপাশ থেকে অদৃশ্য কোলাহল, বন্ধুদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, হাসি, গুরুজনদের উপদেশ, বাবা-মায়ের তিরস্কার – যেন পোড়া মৌচাক থেকে ক্ষেপে বেরিয়ে আসা শত শত মৌমাছির মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সঞ্জয়ের ওপর। নিজেই ছুটেছিল ডাক্তারের কাছে অবশেষে। গত দু'রাতে চোখের পাতা এক করতে পারে নি শুনে ডাক্তার ওকে নার্ভ ঠান্ডা করার সেডেটিভ দিয়েছিলেন সেদিন। বাড়ি ফিরে এসে ভাল করে ঘুমোবে বলে সেডেটিভের প্রায় পুরো শিশিটাই খেয়ে ফেলেছিল সঞ্জয়। কি যে হয়ে গেল তারপর !

এতদিন কেমন শান্তিতে ঘুমিয়েছিলাম, ভাবল সঞ্জয়, "কেন ভাঙ্গল ঘুমটা"!

সঞ্জয় একটু সুস্থ হলে আইলীন সীবর্ন ওকে নিজের বাড়িতেই নিয়ে এসেছিলেন। ম্লানকণ্ঠে বলেছিলেন, "কি করে অতটা স্বার্থপর হতে পারলে তুমি? তোমার বাবা, মা, পরিবার, আমাদের কথা একবারও মনে পড়ল না? ইউ ডিসপয়েন্ট মী, সন্"!

নির্বাক ছিল সঞ্জয়।

কয়েক দিন পর আইলীন সীবর্নের বাড়িতেই জর্জ এসে হাজির হয়েছিল।

– "চলো আমরা ওয়েস্টর্ন অস্ট্রেলিয়া ঘুরে আসি", সঞ্জয়কে বলেছিল জর্জ, "ফর অ্যাবাউট টু উইক্স্" । ইউনি খুলতে ত' এখনো দেড়মাস ।

– "হোয়াট আ গ্রেট আইডিয়া," বলেছিলেন আইলীন সীবর্ন ।

জর্জের গাড়ির পেছনে ছোট একটা ক্যারাভান লাগিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ওরা, অ্যাডিলেড, পোর্ট অগস্টা, নালাবোর, পার্থ । সঞ্জয়ের জীবনে সেই সময়টা থেকে গিয়েছিল চির-স্মরণীয় হয়ে । সেই ভ্রমণকালে, একদিন একটা পার্কে বসে লাঞ্চ খেতে খেতে হঠাৎ জর্জ বলেছিল, "তোমার মত বয়সেই জুলির কাছ থেকে আমি ঠিক এম্নি আঘাত পেয়েছিলাম – সে কত বছর আগের কথা!

– "জুলি"? চম্কে উঠে বলেছিল সঞ্জয় ।

– "হ্যাঁ" । ফুট্ফুটে, ছট্ফটে, ফান্লাভিং একটা মেয়ে ছিল জুলি । প্রাইমরি স্কুলে আমাদের বন্ধুত্ব । সেই বন্ধুত্বই আমাদের প্রেমের বাঁধনে বেঁধে ফেলেছিল সতেরো বছর বয়সে । আমরা এন্গেজ্ড হয়েছিলাম । আর ঠিক তখনই যুদ্ধে যেতে হ'ল ।

– "তারপর ?" সঞ্জয় জিজ্ঞেস করেছিল ।

– যুদ্ধে যাবার সময়ে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম যে পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করব । প্রয়োজন হলে, সারাটা জীবন ।

কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল জর্জ । তারপর বলেছিল, কিন্তু যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে শুনলাম জুলি এক ডাক্তারকে বিয়ে করে ব্রিসবেনে চলে গিয়েছে । আমার আংটিটা মার হাতে দিয়ে গিয়েছিল, অবশ্য ।

– তুমি আর বিয়ে করলে না কেন?

– নানা কারণে । আর সেভাবে কাউকে ভালবাসতেই পারলাম না । তোমার মত আমারো নর্ভস্ ব্রেক ডাউন হয়েছিল । শুধু জুলির জন্য নয়, টু বী ফেয়র অ্যান্ড অনেস্ট । যুদ্ধের আফ্টারম্যাথ আমাদের পরিবারকেও বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল । আমার বড় ভাই তো আর বাড়িই ফিরল না । মা, বাবা দুজনেই খুব কাতর হয়ে পড়েছিলেন । কয়েক বছর পরে, কিছুটা সুস্থ হয়ে, আমি মনপ্রাণ দিয়ে আমাদের ফ্যামিলি বিজনেসে লেগে পড়লাম । ক্রমে ব্যবসায় যেমন যেমন সাফল্য এলো, নেশাগ্রস্ত মানুষের মত আমিও সেই সাফল্যের পিছনে ছুটে চললাম । ব্যবসাই হয়ে উঠেছিল আমার নতুন প্রেয়সী । তারপর, অনেকগুলো বছর পর একদিন ঘুম থেকে উঠে আয়নায় নিজের ছায়া দেখে বুঝলাম আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি । প্রেম আর কখনো আমার জানালায় এসে দাঁড়াবে না ।

– "সরি", অস্ফুটে বলল সঞ্জয় ।

– তোমাকে আমার অ্যাড্ভাইস, মাই বয়, মুভ অন্ । যে প্রেম তোমাকে ফিরিয়ে দিল তার পায়ে আর মাথা কুটে নিজেকে ব্যর্থ কোরো না । মনে করো সে তোমার যোগ্যই ছিল না ।

– "আমি আর কোনদিন কাউকে ভালবাসব না" । সঞ্জয় দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল, "আই হেট হর । আই হেট অল্ গল্র্স্ । আ বঞ্চ অফ্ ফ্লর্টস্ দে আর । নথিং বট্ ফ্লর্টস্" ।

– এখন তুমি এরকমটাই ভাবছ, ওর কথা শুনে হেসে বলেছিল জর্জ, কিন্তু একদিন দেখবে সত্যিকারের প্রেমের সন্ধান তুমি পেয়েছ। নট্ অল্ অফ্ দোস্ গর্লস্ আর ফ্লর্টস্, ইউ নো।

* * * * *

সঞ্জয়ের গল্প শেষ হল। শ্রীতমা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে আছে। মুখের অভিব্যক্তি নির্বিকার। ওর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে সঞ্জয় বলল, "শুনছো, শ্রী"?

– "হুঁ", যেন ঘুমের ঘোরে বলল শ্রীতমা।

– কিছু বলছ না কেন ? কিছু বল, প্লীজ।

– ওই কি সেই শর্মিলা বসু যাকে আমরা শান্তি নিকেতনে দেখেছিলাম ?

– হ্যাঁ। সেই।

– তাই তুমি অমনভাবে ওর নাগাল থেকে পালিয়ে আসতে চাইছিলে ?

– হ্যাঁ। ওকে আমার অসহ্য লাগে এখন।

– তাই? কিন্তু ওই শর্মিলাই তো তোমার প্রথম প্রেম, নয় ? কৈশোরের উন্মাদনা, নতুন যৌবনের সব আবেগ দিয়ে তুমি ওকেই প্রথম ভালবেসেছিলে ? সত্যি কি না বলো।

– হ্যাঁ, বেসেছিলাম। সত্যিই ভালবেসেছিলাম। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই ভালবেসেছিলাম। কিন্তু, ওর আসল প্রকৃতি বুঝতে পেরে, এখন ওকে ঘৃণা করি আমি।

– আগে আমাকে এ কথা বলো নি কেন ?

– বলতে চাই নি, কারণ আমার ভয় ছিল তুমি হয়ত' ভুল বুঝবে আমাকে।

– তাহলে আজ হঠাৎ মত পালটালে কেন ? কেন বলতে বসলে হঠাৎ তোমার আর শর্মিলার উপাখ্যান ? কেন, সঞ্জয় ?

শ্রীতমার মুখের চেহারা তখন রক্তহীন, ফ্যাকাসে। আবেগে থরথর করে কাঁপছে ওর দেহ। সেদিকে চেয়ে সঞ্জয় বলতে সাহস পেল না যে শর্মিলার ওরকম চিঠি না পেলে ও হয়ত' কোনদিনই সেই পুরনো উপাখ্যান পাড়ত না। কবরে সমাধিস্থ তো করেই ফেলেছিল সঞ্জয় তার প্রথম প্রেম, ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি।

শ্রীতমাকে ভালবেসে এখন সঞ্জয় বুঝতে পারে প্রকৃত ভালবাসা ব্যাপারটা কি!

– "আমার মনে হচ্ছিল কিছু দিন থেকেই যে তোমার কাছে কিছু লুকোব না আমি। তাই –"

শ্রীতমা চুপ করে বসে রইল। ওর খুব কাছে সরে এসে দুই হাতে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে, গাঢ়স্বরে সঞ্জয় বলল, "আমি তোমাকে বাস্তবিকই মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, শ্রী। আই ডু কেয়ার অ্যাবাউট ইউ, উইথ অল্ মাই মাইট্ অ্যান্ড সোল। পৃথিবীর কোন শক্তি শত চেষ্টা করেও আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না"।

নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করে নিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল শ্রীতমা, "বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আমি শুতে চললাম"।

পরের দুটো দিন খুব চুপচাপ রইল শ্রীতমা। কত কি ভেবে চলেছে যেন। ওদের বেডরুমের পাশের ঘরটাতে পৃথক্ শয্যা প্রস্তুত করল নিজের জন্য। সঞ্জয়কে নিজেই বলল, "আমাকে একটু ভাবতে দিতে হবে। আই নীড মাই ওন স্পেস"।

– "কি রে শ্রী, কি হালচাল ? আমাকে দেখে নজর বাঁচিয়ে চলে যাচ্ছিলি যে বড়"? পেছন থেকে ছুটে এসে বিজয়া ওর কাঁধ খিম্‌চে ধরে হেঁকে বলল, "অ্যাই, শ্রীতমা ব্যানার্জী, ভেবেছিলি আমি তোকে দেখতে পাব না"?

সাইকোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে, ইনস্টিট্যুট ক্যাফের দিকে হেঁটে চলেছিল শ্রী, আনমনে।

বিজয়াকে দেখে বলল, "আরে, তোকে তো খেয়ালই করি নি"!

– তা তো করবিই না। এখন যে তোর অন্য জগতে বাস কি না।

– আসলে আমাকে একটা সেমিনারে যেতে আছে আজ বিকেলে। সেটা নিয়ে একটু প্রি-অকুপায়েড।

– তা অবশ্য ঠিক। আর দ্যাখ্, ওদিকে ফাইনাল পরীক্ষাও তো হু হু করে এগিয়ে আসছে আমাদের দোরগোড়ায়।

– তা আসছে। আমি তো ভাবছি এবার মার কাছে মুভ-ইন্ করব। ওখানে থাকলে পড়াশোনার সুবিধে হবে।

– "তার মানে? ওরকম হেল্পফুল বর থাকতে তোর নিজের বাড়িতে পড়াশোনায় অসুবিধে হবে! যাঃ"! থম্‌কে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল বিজয়া।

ওরা ততক্ষণে ক্যাফেটেরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। লাঞ্চ টাইম। ক্যাফেটেরিয়ার হাওয়া বেশ সরগরম। একটা কোণায় বসে চা আর অমলেট অর্ডার দিল ওরা।

বিজয়া লক্ষ করল, শ্রীতমা যেন গভীর চিন্তায় ডুবে আছে, সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে।

– "কি রে বললি না তো"? আবার প্রশ্ন করল বিজয়া।

– "কি বললাম না"? শ্রীতমার কণ্ঠে বিস্ময়।

– ওই যে বলছিলি – তোর মায়ের বাড়ি মুভ-ইন্ করছিস ?

– "হ্যাঁ রে", ঘাড় নেড়ে বলল শ্রীতমা, "এই উইকেন্ডেই চলে যাব মার ওখানে। মার বাড়িতে থাকলে পড়াশোনার সুবিধে হবে।"

– তুই ভাল আছিস তো, শ্রী?

– "একদম বিন্দাস আছি"। শ্রীতমা হেসে সোজা হয়ে বসল, "তোর কি খবর, জয়া ? আমাদের পবিত্রই বা কেমন আছে? কয়েকদিন দেখা পাই নি কেন?"

– ঠিক জানি না। কয়েকদিন আমিও দেখি না পবিত্রকে।

– সে কি! তোরা দু'জনে তো বেস্ট ফ্রেন্ড্‌স্!

– তো ? তার মানে কি এই যে আমরা একে অন্যকে ছায়ার মত ফলো করব ?

– "নাহ্, তা অবশ্য নয়"। শ্রীতমা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল। ভাবল, জয়াও কি কিছু লুকোচ্ছে ওর কাছে !

ক্যাফেটেরিয়া থেকে বেরিয়ে ওরা নিজের গন্তব্যের দিকে চলে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে আপন মনে বিজয়া ভাবছিল। গত উইকেন্ডেই, ওরই উৎসাহে মেতে উঠে পবিত্র ওর সঙ্গে সারনাথে গিয়েছিল। সারাদিনের ট্রিপ। বেশ আনন্দেই সময় কেটেছিল ওদের, সারনাথে আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়ে। দুপুরে লাঞ্চ খাবার জন্য যখন দোকান খুঁজতে বেরুল ওরা, মূল্যের দিক থেকে শ্রী বসন্ত বাহার দোকানটাই পছন্দ হয়েছিল পবিত্রর। কিন্তু বিজয়া বেছে নিল বৈশালি রেস্টোরেন্ট। সেখানে নাকি সাউথ ইন্ডিয়ান খাবে সে। পবিত্র ইতস্ততঃ করেছিল, "কিন্তু বসন্ত বাহারে তো খাবারের দাম অর্ধেক। সেখানেই চল্"।

– "নাঃ! বৈশালিতেই যাব", বিজয়া বলেছিল, "দাম বেশী হলে কি হবে, ওদের সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারগুলো জমজমাট"। তারপর হাত বাড়িয়ে পবিত্রর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলেছিল, "আমার সঙ্গে এসেছিস যখন, তখন টাকার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। বুঝেছিস"?

পবিত্র নিঃশব্দে ঘাড় নেড়েছিল।

তারপর বৈশালিতে খাওয়ার পাট চুকিয়ে, কাউন্টারে টাকা দিতে এগিয়ে গেল পবিত্র।

ছুটে গিয়ে পেছন থেকে ওর শার্টের কলার চেপে ধরে বিজয়া বলল, "এই দাঁড়া। করছিস কি? ইট্ ওয়াজ্ গোয়িং টু বী মাই সাউট। রিমেম্বর"?

ওরা দুজনেই দেখল কাউন্টারের লোকটা হাসছে। অপ্রস্তুত হয়ে পবিত্র লোকটার হাতে টাকা তুলে দিয়ে বিজয়াকে চাপা গলায় বলল, "আচ্ছা, দিস। পরে দিস। এখন চুপ করে থাক"।

মিউজিয়াম দেখা হয়ে গেলে ওরা মৃগদাওয়ে একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে বসল।

– "তোর প্রেসেন্টেশন কেমন গেল রে, পবিত্র"? বিজয়া জিজ্ঞেস করল।

– ভালই। কিন্তু আরও ভাল হতে পারত। আমি খুব নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম, তাই ----

– ঐ তোর দোষ, পবিত্র। কখনো কিছুতেই তুই ওয়ান হন্ড্রেড পর্সেন্ট খুশী হোস না। কেন বল্ তো ?

পবিত্র হাসল।

সেদিকে চেয়ে বিজয়া বলল, "আমাদের কারো জীবনে যে কোন কিছুই একেবারে পার্ফেক্ট হয় না। কিছু না কিছু খুঁত থেকেই যায়। এটা তুই কবে বুঝবি, বল্ তো"?

– "হুঁ," বলে পবিত্র আবার হাসল।

– আর দ্যাখ্, জীবনে সম্পূর্ণতাও তো কখনো আসে না। অভাববোধও থেকে যায় কিছু না কিছু। এটা মানবি তো?

পবিত্র ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলল, সে মানে।

– তবে?

– কি তবে ?

– তোকে প্রায়ই দেখি ডিপ্রেস্‌ড্‌ হয়ে কি সব ভাবছিস ? কেন পবিত্র ? সামনে তোর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সেটার কথা ভেবেই তো তোর মনের সব অবসাদ কেটে যাওয়ার কথা।

– আমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে, বলছিস ?

– বলছিই তো।

পবিত্র সহসা হো-হো করে হেসে উঠে বলল, "কিন্তু আমি যে আমার ভবিষ্যৎ দেখতে গিয়ে শুধুই অন্ধকার দেখতে পাই, জয়া। শুধুই অন্ধকার আর রিক্ততা"।

– "আই হেট দিস্‌ কাইন্ড অফ্‌ নেগেটিভ কথাবার্ত্তা", ঝাঁঝিয়ে উঠল বিজয়া, "আমি তোর কি ক্ষতি করেছি রে পবিত্র, যে আমাকে এই ধরণের কথা বলিস তুই! নট্‌ অ্যাট্‌ অল্‌ ফেয়ার"।

পবিত্র মিটি মিটি হাসছে। বিজয়া আরো জ্বলে উঠে বলল, "আর রাখ্‌ তোর ভবিষ্যৎ দেখা। সেদিন নিজের চোখেই তো দেখলি সঞ্জয়দা আর শ্রী কেমন ভাল আছে। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার করছে। ওদের বিষয়ে তুই যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলি, কি হ'ল তার? বলিস নি তুই, ওরা খুব অসুখী হবে"?

– "উঁহু। বলেছিলাম বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে খুব অসুখী হবে ওরা", মাথা নেড়ে বলল পবিত্র।

– ওদের বিয়ের তো সাত-আট মাস হতে চলল। দেখছিস ওদের অসুখী ?

– ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে। মানছি আমার ভবিষ্যৎবাণী সব ভূয়ো। আমি আর ভবিষ্যৎ দেখতে চেষ্টাই করব না। খুশী তো"? দুই হাত জোড় করে বলল পবিত্র।

সব টেনশন কেটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। ওরা দুজনে প্রাণখোলা হাসি হাসল। তারপর হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলল।

* * * * *

(চলবে)

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায় – জন্ম বারাণসী শহরে। দীর্ঘকাল মেলবোর্ণ শহরের বাসিন্দা। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ.। মেলবোর্ণের মনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটর সায়েন্সে ডিপ্লোমা। বিভিন্ন সরকারী রিসার্চ বিভাগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ও অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন। দেশ, সানন্দা, আনন্দবাজার পত্রিকা, নবকল্লোল এবং বর্তমান সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা। উপন্যাস এবং ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে শারদীয় দেশ, সানন্দা ও আনন্দলোকে। অবসর সময়ে বই পড়তে ভালবাসেন। ভালবাসেন ভ্রমণ। ছন্দসীর প্রকাশিত গ্রন্থ – অভিযান (আনন্দ), মায়াজাল (আনন্দ), ছায়া পরিসর (লাল মাটি প্রকাশন), নির্বাচিত গল্প প্রথম ভাগ (দাশগুপ্ত পাব্লিশার্স) এবং Seven Favourite Stories – translation of seven short stories by Sirshendu Mukhopadhyay (Dasgupta Publishers)। ওয়েব সাইট : www.bando.com.au

ধারাবাহিক উপন্যাস

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ১৯

অনেকক্ষণ হয়ে গেল, অর্পিতা বাঁধানো ঘাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। বেশ লাগছে, অর্পিতার আরও কিছুটা সময় এ'ভাবেই বসে থাকতে ইচ্ছা হল। আজকের দিনটা বড় অন্যরকম, এমন দিন তার জীবনে কখনও আসেনি। কখনও আসবে বলে ভাবেওনি সে। গত কয়েকদিন ধরে তার জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে, তাতে প্রথমটায় সে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল, তারপর অবাক ভাবটা কেটে গিয়ে কেমন একটা থ'মেরে গিয়েছিল। কিন্তু আজ সকাল থেকে আবার নতুন একটা পর্যায় শুরু হয়েছে, বাসে জানলার ধারে বসা ইস্তক তার নিজেকে ভীষণ ভালো লাগতে শুরু করেছে। সত্যি, কতটা বদল হয়ে গেল তার জীবনে, কত কিছুই বদলে যাচ্ছে তার, হারিয়ে যাওয়া অনেক কিছুই আবার নতুন করে ফিরে পাচ্ছে সে, এমনকি পরিচয়ও।

অর্পিতার হঠাৎ একটা মজার খেলা খেলতে ইচ্ছা হল। হাতে দুটো শুকনো গাছের পাতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। নদীতে এখন ভাটা চলছে, একদমই আস্তে আস্তে কোনওরকমে বয়ে চলেছে জল। অর্পিতা তার বাঁ দিকে হাত পঞ্চাশেক দূরের বটগাছটার দিকে তাকাল। নদীর উপর একদম ঝুঁকে পড়েছে গাছটা। মনে-মনে ওই গাছটা অবধি সে তার খেলাঘরের সীমানা স্থির করল। তারপর একটা শুকনো পাতা নদীর জলে আলতো ভাসিয়ে দিয়ে বলল, ''এই আমার ভালো জীবন আর নাম ভেসে চলে গেল''। তারপর এই দৌড়ে হাত পঁচিশেক দূরত্ব অতিক্রম করে দ্বিতীয় পাতাটা একদম ঘাটের ধার ঘেষে গুঁজে দিল ঘাটের খাঁজে। পাতাটা জলের ধাক্কায় অল্প অল্প দুলতে লাগল আর অর্পিতাও বলতে লাগল, ''এই আমি আটকে গেছি, খারাপ জীবনে আটকে গেছি'', দু-এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তারপর হঠাৎ পাতাটা খাঁজ থেকে বের করে হাতে তুলে নিল সে আর তারপর হাতের চাপে মড়মড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিল। ''খারাপ জীবন শেষ। কিন্তু আমার ভালো জীবন, তুমি কোথায় ?'' বলতে বলতে বাঁ দিকে তাকাল সে। প্রথম পাতাটা ভাসতে ভাসতে তখন বটগাছটার প্রায় কাছাকাছি। অর্পিতা এমন ভাবে দৌড় শুরু করল যেন পাতাটা বটগাছের সীমানা পেরিয়ে গেলেই তার ভালো জীবনটা চিরকালের মত হারিয়ে যাবে। পাতাটা বটগাছের সীমানা পেরোনোর ঠিক আগে ছোঁ মেরে সেটাকে জল থেকে তুলে নিল অর্পিতা, তারপর সুর করে বলতে লাগল, ''আমি আমার ভালো জীবন ফিরে পেলাম, আমি আবার আমার নাম ফিরে পেলাম, আমার নাম অর্পিতা, অর্পিতা, অর্পিতা। ওগো আমার স্কুল মাস্টার বাবা, আমি খারাপ বলে আমায় ঢুকতে দাওনি ঘরে, কিন্তু দ্যাখো আমি আবার ভালো হয়ে গেছি। ওগো শ্যামদা, ভালোবাসার নাম করে ডেকে এনে বেচে দিয়েছিলে আমায়, দ্যাখো ভালোবাসা আজ আমার বুকে, ওগো কলকাতা শহর আমায় নোংরা মেয়েছেলে বলতে, এই দ্যাখো আজ অবধি বলে চুপ করে গেল অর্পিতা। আজ সকালের একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তখন সবে এই জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছে সে, আশ-পাশটা গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে, হঠাৎ এক সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন তার সামনে। কি সুন্দর চেহারা, সারা গা টা কেমন যেন আলো আলো। অর্পিতা ভিতরে ভিতরে সংকোচে সিঁটিয়ে গিয়েছিল। সন্ন্যাসীর হাতে একটা ফুলের সাজি ধরা ছিল, তাতে ভর্তি ফুল। ভারী মিষ্টি করে হেসেছিলেন সন্ন্যাসী, তারপর খুব স্নেহের স্বরে অর্পিতাকে বলেছিলেন, ''কি রে মেয়ে ? আর কষ্ট নেই তো ? আমার পূজায় আমায় সাহায্য করবি তো ?'' থতমত অর্পিতা কি জবাব দেবে ভেবে উঠতে পারেনি। সন্ন্যাসী কিভাবে জানলেন কি জবাব দেবে ভেবে উঠতে পারে নি। সন্ন্যাসী কি ভাবে জানলেন যে সে কষ্টে ছিল, এখন আর নেই ? ধাতস্থ হওয়ার আগেই সন্ন্যাসী তার দিকে ফুলের সাজিটা এগিয়ে দিয়েছিলেন, তারপর খুব স্বাভাবিক স্বরে বলেছিলেন, ''যা তো মা, সাজিটা মন্দিরে রেখে আয় তো। ''তারপর হতবাক অর্পিতার হাতে সাজিটা ধরিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে অন্যদিকে চলে গিয়েছিলেন। অর্পিতার বিশ্বাস হচ্ছিল না, সে ফুলের সাজি হাতে এক সন্ন্যাসীর মন্দিরে যাবে। কিন্তু কেন জানে না , চলে ও গিয়েছিল। এখন কথাগুলো মনে পড়তে মনটা ভিজে গেল অর্পিতার।

— ''অ্যাই, কি করছ ওখানে দাঁড়িয়ে ?'', ডাকটা কানে যেতে অর্পিতা পিছন ঘুরল। ঘাটের উপর দিকটায় দু'পা ফাঁক করে কোমরে হাত দিয়ে শীর্ষ দাঁড়িয়ে। হাসছে।

ভাঙাচোরা দুর্গটার পাথরগুলোর উপর বসে থাকতে বেশ লাগছে অর্পিতার। গঙ্গার জল তাদের পা ছুঁই ছুঁই করেও না ছুঁয়ে সমুদ্রে ফিরে চলেছে। একটু আগে সূর্যাস্ত হয়েছে। গঙ্গার জল এখন লাল। এই সূর্যাস্তটার লোভেই শীর্ষকে টানতে টানতে সরাসরি গঙ্গার ধারে নিয়ে এসেছে সে। ফলতার আশ্রম থেকে ডায়মন্ডহারবার পৌঁছে হোটেলে ঢোকেনি। ইস ! কি সুন্দর হয়ে যায় পৃথিবীটা সূর্য চলে যাওয়ার সময়। অর্পিতার মনটা খারাপ হয়ে গেল। জীবনে কতগুলো সূর্যাস্ত যে দেখেনি ও। দেখবে কি করে ? বিকেল এলেই তো রংচং মেখে পেট্রোল পাম্পটার সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পড়তে হত, কখন কোন খদ্দেরের সঙ্গে সওদা ঠিক হবে তার প্রতীক্ষায়। তারই মাঝে পাড়ার কোন মস্তান বুকে হাত ছুঁইয়ে যাচ্ছে, মোড়ের মাথার পুলিশ পাছা টিপে রসের নোংরা কথা বলে যাচ্ছে। বেশ্যা হওয়ার ট্যাক্স। বরং সূর্যোদয়ের সঙ্গেই যোগাযোগটা ছিল বেশী। কোনও কোনও দিন ভোরে মাসির সঙ্গে তারা তিন চারটে মেয়ে দল বেঁধে গঙ্গায় স্নান করতে যেত। তখন হয়তো সবে সূর্য্য উঠছে, নদীটাকে খুব শান্ত লাগত ওই সময়ে। নিজেকেও কেমন অন্যরকম মনে হত। তাদের দেখে অন্যদের নাক আর গা সিঁটকোনোরও গায়ে লাগতনা তখন। তবে লোকেদের ঘেন্না দেখে মনটা খারাপ হয়ে যেত। মনে হত, তারা কি এতই খারাপ ? এতটাই নোংরা ? না, অর্পিতা এখন এ'সব নিয়ে আর ভাববেনা। এই যে শীর্ষ ডান হাত দিয়ে ঘিরে রেখেছে ওর পিঠ, অর্পিতা এখন সেই নিয়ে ভাববে। আর ভাববে ফলতার ওই আশ্রমের কথা। ভারী অদ্ভুত লেগেছে তার ওখানে গিয়ে। একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, যা আগে কখনও হয়নি। ওই বয়স্ক সন্ন্যাসী উনি যেন সব জানেন, পড়তে পারেন অর্পিতার ভিতরটা। আজ দুপুরে শীর্ষ আর সে আমগাছটার তলায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছে সন্ন্যাসীর সঙ্গে। খুব সহজ ভাষায় কথা বলেন সন্ন্যাসী। অর্পিতার মনে হয়েছে, সন্ন্যাসী তার আর শীর্ষর গল্পটা পুরোপুরি ধরতে পেরেছেন, এমন কি তার অতীত জীবনটাও। কারণ, সাধারণ কথার ফাঁকে ফাঁকে সন্ন্যাসী এমন কিছু কথা বলছিলেন, যে গুলোর মানে শীর্ষ কতটা বুঝেছে অর্পিতা জানেনা, কিন্তু সে বুঝবে। অর্পিতা বুঝেছে, সন্ন্যাসী কথার ইঙ্গিতে তাদের নতুন জীবন শুরু করতে বলেছেন, নতুন ভাবে সবকিছু দেখতে বলেছেন। অর্পিতার ভালো লেগেছিল কথাগুলোর মানে ধরতে পেরে। সত্যি বলতে কি, অর্পিতার খুব ইচ্ছা করেছিল আজকের দিনটা আশ্রমেই থেকে যেতে। কিন্তু সে আর শীর্ষ আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল যে বিকেল বিকেল ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ে ডায়মন্ড হারবারে রাতটা কাটাবে। এখন অন্যরকম বললে শীর্ষর খারাপ লাগতে পারে, এই ভেবে চুপ করে গিয়েছিল সে।

আচ্ছা, শীর্ষর সঙ্গে তার এই যে সম্পর্ক, এর ভবিতব্য কি ? শীর্ষ কি তাকে চিরকালই এমন ভালোবাসবে ? বলা মুশকিল। পুরুষ দেখে দেখে পুরুষের ভালোবাসায় এখন ভালো লাগে কম, ভয় করে বেশী। আচ্ছা, যদি ভালোবাসেও কোন পরিচয়ে ? শীর্ষ-র অতীত যতই কালচে হোক তবুও তো শীর্ষ ভদ্রবাড়ির ছেলে। কাজেই তার আর শীর্ষর মধ্যে একটা তফাৎ থেকেই যায়। সে তফাৎ শীর্ষর মানা না মানায় কিছুই আসে যায়না কারণ সে তফাৎ তৈরী করে রেখেছে সমাজ। যদি কোন ও দিন সমাজ আঙুল তুলে প্রশ্ন করে, শীর্ষর কথা ছাড়ো, অর্পিতা নিজেও কি বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারবে সে আঙুলের সামনে ? জানে না। শুধু দুটো কথা অর্পিতা নিশ্চিতভাবে জানে। এক, শীর্ষ ভবিষ্যতে তাকে ভালোবাসুক আর না বাসুক, আজকের ভালোবাসাটাও শীর্ষর যদি মোহ হয় তো হোক, সে শীর্ষকে ভালোবেসেছে। আর দুই যে জীবন সে ছেড়ে এসেছে, সে জীবনে আর সে ফিরে যাবেনা কোন ও দিন। সামনে যদি কোনও নতুন জীবনের দিশা নাও থাকে, তবুও না। পথ না পেলেও ক্ষতি নেই শীর্ষর প্রতি নিজেকে ভালোবাসাটাকে বুকে ধরে মোড়ের মাথাতেই বসে থাকবে সে। হ্যাঁ, এতটুকু হলেই চলে যাবে তার। পৃথিবী এত বড় একটা জায়গা, সেখানে কোনও না কোনও একটা কাজ, কোন ও না কোনও একটা আশ্রয় তার জুটে যাবে ঠিক, নিজেকে আর একটুও অসম্মান না করেই। আচ্ছা, সে যদি এই আশ্রমেই চলে আসে ? সন্ন্যাসীর ঠাকুর পূজোয় সাহায্য করতে চায়, হাত লাগায় আশ্রামের সব কাজে ? সন্ন্যাসী কি ফিরিয়ে দেবেন তাকে ? অর্পিতার তো তা মনে হয় না। উনি অন্যরকম মানুষ, না হলে দেখা হওয়া মাত্রই তার হাতে ফুলের সাজি ধরিয়ে দিয়ে মন্দিরে রেখে আসতে বললেন কেন? অর্পিতার খুব ইচ্ছা করল মাঝে মাঝে আশ্রমে এসে সময় কাটাতে। শীর্ষকে সে ইচ্ছাটার কথা বলবে ভাবল।

কেমন যেন থমথমে মুখে বসে আছে শীর্ষ। শীর্ষ কি রেগে রয়েছে কোন ও কারণে ? আজ বিকেল থেকে খুব কম কথা বলছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে শীর্ষ যেন খুব অন্যমনস্ক হয়ে আছে, আবার কখনও কখনও অর্পিতার মনে হচ্ছে যে শীর্ষ বুঝি তার উপরে বিরক্ত হয়ে আছে।

— ''শীর্ষ'', অর্পিতা খুব আলতো করে ডাকল।

একটা অদ্ভুত মুখ নিয়ে শীর্ষ তাকাল তার দিকে।

— ''কি ভাবছো তখন থেকে ? রাগ করেছো আমার উপরে ?'' অর্পিতা চাপা উদ্বেগটা প্রকাশ করে ফেলল।

শীর্ষ প্রশ্নটার কোনও উত্তর দিলনা। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ অর্পিতার দিকে তাকিয়ে নিস্পৃহভাবে প্রশ্ন করল, ''আচ্ছা . . . এরপর আমি কি করব, বলতে পারো ?'' অর্পিতা একটু থতমত খেয়ে গেল। এরপর মানে কি বলতে চাইছে শীর্ষ ?'' কিসের পর শীর্ষ ?''

শীর্ষ উদ্বিগ্নভাবে উঠে দাঁড়ানো, ''এই যে, ভালো হয়ে যাওয়ার পর। একটা গুন্ডা ভালো হয়ে যাওয়ার পরে, তার কি করবার থাকে অর্পিতা, বলতে পারো ?'' শীর্ষ একটু চুপ করে থাকল, কিন্তু কথা শেষ করলনা, ''আমি তো আর মাস্তানিতে ফিরতে পারব না, সমাজের মূল স্রোতটা তেও নয় বোধহয়। কারণ ওখানটায় ফিরতে গেলে সমাজের এত বাঁকাচোরা গলি পেরোতে হবে যে আমি অত ঘাঁটতে রাজী নই। কিন্তু তাহলে করবটা কি ?

একটু চুপ করে থেকে শীর্ষ আবার মুখ খুলল, ''তোমারও তো একই অবস্থা। না করে ঘরে নেবে, না ঘাটে যেতে পারবে ''।

শীর্ষকে খুব অস্থির লাগছে। একদম অচেনাও। লম্বা লম্বা পা ফেলে নদীর ধারে পায়চারি করতে শুরু করল শীর্ষ। মাথা নিচু, যেন কি একটা হারিয়ে গেছে, খুঁজছে। অর্পিতা চুপ করে বসে শীর্ষকে দেখতে লাগল। আকাশের লালভাবটা কমে এসে এখন কালচে আলোয় শীর্ষকে অদ্ভুত লাগছে।

হঠাৎ ব্রেক কষবার মত করে থমকে দাঁড়াল শীর্ষ। ''একটাই উপায় আছে, একটাই। আশ্রম। সাধুবাবার ওই আশ্রম আঁকড়ে ধরা ছাড়া অন্য রাস্তা নেই। সমাজ আমাদের নেবেনা, না নিক, আমাদেরও সমাজকে নেওয়ার দরকার নেই। আমরা ভগবান কে নেব। সাধুবাবা বড় একলা। আমরা সাধুবাবার পাশে দাঁড়াবো, থাকব। আমি জানি, সাধুবাবা আমাদের ফেরাবেন না। ভালো কাজ করতে হবে বুঝলে, ভালো কাজ। না হলে ভালো থাকা যাবে না। তুমি যাবে তো ?''

আনন্দে অর্পিতার চোখে জল এসে গেল। শীর্ষও তার মত করে একই কথা ভাবছে। সন্ন্যাসী তাদের আশ্রয় দেবেন কি দেবেন না, সে চিন্তা তুচ্ছ এখন অর্পিতার কাছে। তারা দু'জন যে এমন ভাবতে পারছে, সেটাই তো সবচেয়ে বড় পাওনা। সন্ন্যাসী যদি না ও নেন, এরপর ঠিক জায়গা খুঁজে নিতে আর অসুবিধা হবেনা তাদের। অর্পিতার মনটা ভীষণ ভালো হয়ে গেল।

শীর্ষ দু'-এক পা এগিয়ে এল অর্পিতার দিকে, ভুরু কুঁচকে অর্পিতাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ কথাগুলো বলে ফেলল সে, অনেকক্ষণ ধরে একটা কথা বলব ভাবছি, কিন্তু কি ভাবে বলব, বুঝতে পারছিনা। অর্পিতা, আমাকে বিয়ে করবে ?''

ঝাঁ ঝাঁ রোদে কলকাতা শহরটা গরম হয়ে আছে এখন। শুধু রোদে নয়, কলকাতা আজ এমনিতেই খুব উত্তপ্ত হয়ে আছে। একটু আগে একটা লম্বা মিছিল হেঁটে গেছে রবীন্দ্র সদনের দিক থেকে ধর্মতলার দিকে। সে মিছিলে কোনও দলের পতাকা ছিল না, এমনকি একটা শব্দ ও নয়। শুধু অনেক মানুষ হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে গেছে। সে মানুষদের মধ্যে এ'শহরের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিরা রয়েছেন, রয়েছেন সমাজের সর্বস্তর থেকে আসা সব বয়সের অরাজনৈতিক মানুষ। পাপান জানে, কেন এ' মানুষেরা হেঁটে গেল। পাপান জানে, আজ শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনই আরও কয়েকটা

মিছিল আসবে ধর্মতলায়, এসে মিশে যাবে একে অপরের সঙ্গে এ' মানুষগুলোর নিজস্ব কোনও দাবি-দাওয়া নেই। সাধারণতঃ মানুষ মিছিলে আসে নিজের কোন ও স্বার্থজনিত কারণ থাকলে। কিন্তু আজ সবাই মিছিলে এসেছে অন্য এমন একটি মানুষের জন্য, যে নিজে এই মিছিলে নেই। সে মানুষ এখন নামকরা এক বেসরকারী হাসপাতালে, খুব সম্ভবতঃ নাম কা ওয়াস্তে একটা লড়াই লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে। পাঁচদিন আগে কলকাতার পূর্বদিকে এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গেছে। একটি উনিশ বছরের মেয়েকে নৃশংস ভাবে ধর্ষণ করেছে কিছু পশুর দল, তারপর এমনভাবে ছিন্ন ভিন্ন করে রেখে গেছে যে মেয়েটির মৃত্যু এখন সময়ের অপেক্ষা। যারা এই বর্বর কাজ করেছে, তার সবাই, যতদূর জানা গেছে, ভিন রাজ্যের শ্রমিক, পশ্চিম বঙ্গের কোনও রাজনৈতিক দলেরই ছাতার নিচে তাদের বসবাস নেই। তবু প্রথমদিকে সরকার গড়িমসি করছিল ওই অসভ্য মানুষগুলোকে গ্রেফতার করতে। কারণটা এই বয়সেও পাপান বোঝে। একটি মেয়ে ধর্ষিতা হলে সরকারের যত না চিন্তা সেই মেয়েটির ব্যাপারে থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশী চিন্তা থাকে সরকারের নিজস্ব সম্মানরক্ষার ব্যাপারে। রাজ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটে যাওয়া মানে প্রশাসনের গাফিলতির ফাঁক-ফোকরগুলো চোখে আঙুল দিয়ে স্পষ্ট করে তোলা। আবার বিরোধী দলের কাছেও ব্যাপারটা কয়েনের উল্টো পিঠ মাত্র। তারাও মেয়েটির বিষয়ে কম, সরকারের দিকে কাদা ছোঁড়ার চিন্তা ব্যয় করে বেশী। তাই এমন ঘটনা ঘটলেই সরকার তটস্থ হয়ে ওঠে। ধাঁমাচাপা দিতে চায় ঘটনাটাকে, মেয়েটির চরিত্র নিয়ে কথা তুলে বিষয়টি হালকা করবার চেষ্টা করে। যেন ধর্ষিতা মেয়েটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রহীনা হলেই তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভোগ করা যায় ? এক্ষেত্রে অবশ্য শেষ অবধি কোনওটাই সুবিধের হয়ে ওঠেনি। মেয়েটি উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের, তাই চট্ করে তার গায়ে কালি লাগানো মুশকিল, দ্বিতীয়তঃ প্রথম থেকেই স্থানীয় মানুষেরা এককাট্টা হয়ে যাওয়াতে প্রশাসন চাপে পড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। স্থানীয় মানুষদের সেই প্রতিবাদের ভাষা এখন সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশাসন গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে ওই দোষী মানুষগুলোকে আর সেই মানুষদের শাস্তি ও মেয়েটির সুবিচার পাওয়ার দাবিতে আজ শহরে এই মহা মৌনমিছিল।

পাপানের খুব ইচ্ছা করল, সে-ও মিছিলে পা মেলায়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, ভেঙে পড়া সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়ে। কিন্তু আজ সে নিজেই বড় ভেঙে পড়া। একটু আগে একটা বড়মাপের ঘটনা ঘটে গেছে তার জীবনে। সে ঘটনা একদম অপ্রত্যাশিত না হলেও, অনাবশ্যক আর আঘাত দেওয়ার মতো তো বটেই। তাতে ভিতরে ভিতরে চুরমার হয়ে গেছে পাপানের মন। এখন কোনও মিছিল নয়, পাপানের প্রয়োজন একাকীত্ব। পাপান অ্যামেরিকান সেন্টারের উল্টো দিকের ফুটপাথে পিছন ফিরে আবার ময়দানের ভিতর দিকে হাঁটতে শুরু করল। আর অনেকটা ভিতরে গিয়ে যেখানে একটা বড়-সড় বটগাছ ময়দানের উত্তর দক্ষিণ ভাগাভাগি করে দাঁড়িয়ে আছে তার নিচে বসে পড়ল। এখন দুপুর বেলায় মিছিলের শহরে এ' গাছের নিচে আর কেউই নেই। ছড়ানো মাঠটার দিকে তাকিয়ে পাপানের ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। মানুষের মন কেন এই মাঠের মত বিস্তৃত হয় না ? কেন মানুষ ছোট- ছোট ব্যাপারে এত আঁকড়ে থাকে ? কেন ইমনের মত কেবল যা ঘটছে, সে'টুকুর মধ্যেই নিজের দেখাটাকে আটকে রাখে, তার বাইরে আর নিজেকে মেলাতে পারেনা ?

আজ ইমনের সঙ্গে তার দেখা করবার দিন। ইমনই হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছিল তাকে। এ'ভাবে স্কুল না গিয়ে আসাটা খুবই মুশকিলের, তবু ম্যানেজ করে চলে এসেছিল পাপান। মা আজ থাকলে হয়তো এমন করে আসাই হতনা, কিন্তু বাপিকে যা হোক একটা কিছু বুঝিয়ে দেওয়া তেমন মুশকিলের না। আসবার পর ইমনের ডাকবার কারণ শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। ইমন বাপি আর শিঞ্জিনিমাসির নামে সরাসরি অভিযোগ এনেছিল। গত রবিবার নাকি সে বাপিদের সাউথ সিটি ফুডকোর্টে একসঙ্গে দেখেছে। বাপিরা নাকি হাত ধরাধরি করে বসেছিল। পাপান এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু খুঁজে পায়নি। সে তো বাপি আর শিঞ্জিনিমাসির বন্ধুত্বের কথা খুব ভালোভাবেই জানে। কিন্তু ইমনকে সে' কথা বুঝিয়ে বলতে যেতেই ইমন বিশ্রীভাবে আক্রমণ করে উঠেছিল। যা তা বলে যাচ্ছিল বাপি আর শিঞ্জিনিমাসির নামে, কুৎসিৎ সব ইঙ্গিত ছিল ওর কথায়। শেষে পাপান বাপিদের সাপোর্ট দিচ্ছে দেখে নোংরা কথার তীরটা পাপানের দিকে ও ঘুরিয়ে ছিল ইমন। বলেছিল, আসলে পাপান ও ওইরকমই, পাপানদের রক্তেই নষ্টামি আছে, না হলে পাপান এই ব্যাপারটাকে এইভাবে সমর্থন করতে পারেনা। পাপান হতবাক হয়ে গিয়েছিল, ইমন রক্ষণশীল, ইমন একটু গোঁয়ার, কিন্তু তা বলে যে ইমন এমনভাবে কোনওদিন বলতে পারে, পাপান কল্পনাও করেনি। অনেকক্ষণ চেঁচামেচির পরে বোধহয় ইমনের রাগটা একটু কমে এসেছিল। ''চলো, মাঠে

বসি একটু, বলে পা বাড়িয়েছিল মাঠের ভিতরদিকটায় । পাপান নড়েনি । খুব শান্ত গলায় ইমনকে বলেছিল, ''ইমন, তোমার পিছনে একটা রাস্তা আছে, যেটা দিয়ে একটু আগে তুমি হেঁটে এসেছিলে । ওটা দিয়েই আবার ফিরে যাও, আর কখনও আসবার চেষ্টা করোনা''।

ইমন থতমত খেয়ে গিয়েছিল । খুব সম্ভবতঃ এমন প্রতিক্রিয়া আশা করেনি সে । কিছু একটা বলতে গিয়েও বলতে পারেনি, পাপানই আবার বলেছিল, ''তুমি আমাকে আমার জীবনের খুব মূল্যবান মুহূর্ত উপহার দিয়েছ ইমন, তার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ । কিন্তু ব্যস, ওইটুকুই, আর নয়, আর একটুও নয়, এরপর নয়'' এরপর আর ইমনকে সুযোগ দেয়নি পাপান, সোজা হেঁটে চলে এসেছিল চৌরঙ্গী রোডের দিকে ।

ভালোই হল । জীবনের এই চ্যাপ্টারটা শেষ হওয়ার বোধহয় প্রয়োজন ছিল । পাপান ভাবল, সে বোধহয় শেষের দিকটা একটু জোর করেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সম্পর্কটা । আসলে সম্পর্ক গড়ে তুলতে, সম্পর্কের ভিত মাটিতে শক্ত করে গাঁথতে মানুষের কিছুটা সময় লাগে তো, তাই সম্পর্কের উপর মানুষের কেমন যেন একটা মায়া পড়ে যায় । এই যে অনেক সময় মানুষ জোর করেই সম্পর্ক টেনে নিয়ে চলে, তার মূলে আছে আসলে এই মায়া । আর ভদ্রতাবোধ এবং অভ্যাসের দাম । তাই একটা নির্দিষ্ট সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে গেলে, সেটা ছাড়তে মানুষেরা বোধহয় অস্বস্তিতে ভোগে । অথচ সম্পর্কের তো শিকল হওয়ার কথা নয়, সম্পর্ক তো আকাশের মত, বিস্তৃত এবং বন্ধনহীন, যেমন বাপিদেরটা বাপি আর শিঞ্জিনিমাসির মধ্যেকার রসায়ন ওই আকাশের মতই যা নিজের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ গুলোকেও বড় করে দেয়, ছড়িয়ে দেয় । না হলে শিঞ্জিনি মাসি মা কে অত ভালোবেসে ফেলে কি করে ? না হলে যে বাপি কেরিয়ার নিয়ে অত মেতেছিল, সে বাপিই আজ এত অন্যরকম কেন ? পাপান দেখেছে, বাপি কত কি লেখে আজকাল আর যখন লেখে কি তন্ময় হয়েই না লেখে । কিছু কিছু প্রোডাক্টের যেমন বাই প্রোডাক্ট থাকে সুন্দর সম্পর্কেরও তেমনি । সম্পর্কের সৌন্দর্য্য শুধু সম্পর্কটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া মানুষগুলোরই নয়, তাদের আশপাশের মানুষদেরও ভেতরে পরিবর্তন এনে দেয় । সেটা নিজেকে দিয়েই বোঝে পাপান । পাপান বোঝে তার ভাবনা চিন্তাও অনেক পাল্টে গেছে অনেক স্বচ্ছ হয়ে গেছে । তাই তো পাপান আজ এমন ভাবে . . . এতটা . . . ।

পাপান উঠে পড়ল । নিজেকে আর ছোট-খাটো দেনা-পাওনার মধ্যে আটকে রাখবেনা, ভাবল সে । একদিন বাপির টেবিলে একটা বই রাখা ছিল, পাপান কৌতূহল ভরে উল্টে-পাল্টে দেখেছিল খানিকটা, পুরোটা বোঝেনি । জোনাথন লিভিংস্টোন নামের একটা সিগাল পাখিকে নিয়ে গল্পটা যে তার ঝাঁক ছেড়ে অন্য এক উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল । সেদিন বোঝেনি কিন্তু আজ পাপান একটা কথা বুঝল । জীবনে ভালোভাবে থাকতে গেলে জোনাথন লিভিং স্টোন হতে হবে ।

নিজের আশপাশ থেকে একটু উপরে না গিয়ে দাঁড়ালে নিজে বা নিজের অবস্থানের সঠিক মূল্যায়ণ ঘটানো যায় না, আপগ্রেডেশন অব্ লাইফ হয়না । নতুন নতুন দিগন্ত ছুঁতে হয়, তবেই জীবন জীবনের মত হয়ে ওঠে ।

পাপানের খুব ইচ্ছা করল, একটু আগে যে মিছিলটা হেঁটে গেছে তাতে সামিল হওয়ার । ও মিছিলে যে মানুষেরা হেঁটে গেছে, তারা হয়তো সবাই লিভিংস্টোন সিগাল নয়, তবু আজকের মত অন্ততঃ তারা একটু নতুন দিগন্ত ছোঁয়ার চেষ্টা করছে । ময়দানের উপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে পাপান ধর্মতলায় জমায়েতটার কাছে এসে দাঁড়াল । প্রচুর মানুষ এসেছে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে । নিজেকে তাদের একজন ভেবে নিতে পাপানের ভালো লাগল ।

— ''কি ব্যাপার ? তুমি এখানে কি করছ পাপান ?'', পাপান ঘুরে দাঁড়াতেই শীর্ষ কাকাকে দেখতে পেল । জিনসের উপর একটা পাঞ্জাবি পরে হাসছে একটা চেয়ারে বসা শীর্শকাকা, পাশে একজন মহিলা । শীর্ষকাকাকে দেখতে পেয়ে পাপানের ভালো লাগল । কত বদলে গেছে মানুষটা । বাপির কাছে শুনেছে, একসময় নাম করা গুন্ডা ছিল শীর্ষকাকা, তারপর সব ছেড়ে দিয়েছে । সেদিন বাপি বলছিল, ''জানিস, শীর্ষটা মাঝে মাঝে ফলতার আশ্রমে যায় । আমায় অবশ্য বলেনি, লজ্জা পেয়েছে বোধহয় । ওর এখন রূপান্তর চলছে তো রূপান্তরের সময় মানুষ একটু সংকুচিত হয়ে থাকে'' । শীর্ষকাকার পাশের মহিলাকে আগে কখনও না দেখলেও পরিচয়টা আন্দাজ করে নিল পাপান । ইনিই তাহলে সেই বিউটি । পাপান বুঝেছে যে

শীর্ষকাকা খারাপ পাড়ায় যেতে যেতে এই ভদ্রমহিলাকে ভালোবেসে ফেলল ওখান থেকে বের করে এনে স্বাভাবিক জীবন দিতে চেয়েছে। ওই দুটো মানুষের দিকে তাকিয়ে পাপানের হঠাৎ মনে হল যে ওরা অনেকটাই লিভিংস্টোন সিগাল হয়ে গেছে।

''কিছুই না, এই এমনি আর কি। এদিকে এসেছিলাম, তাই...'' পাপান উত্তরটা দিল।

— ''না, না, এমনি কেন ? যা ঘটেছে তাতে তো সচেতন ভাবেই আসা উচিৎ আমাদের প্রত্যেকের শীর্ষকাকার পাশের থেকে বিউটি বলে উঠলেন, ''দাঁড়িয়ে কেন ? বোসো না।'', পাশের খালি চেয়ারটার দিকে দেখালেন বিউটি।

— ''তুমি বোধহয় আমাকে চেনো না পাপান। আমিও অবশ্য তোমায় চিনতাম না, তোমার কাকাই চেনালো। আমি অর্পিতা শীর্ষর বন্ধু'', খুব সহজ সুরে আলাপচারিতা ভেসে গেল। ওহ। এনার ভালো নাম তাহলে অর্পিতা। বাঃ বেশ সুন্দর নাম, ভাবল পাপান, ''আপনারা বুঝি কোনও মিছিলের সঙ্গে এই জমায়েতে এসেছেন ?'' পাপান কথা বাড়তে চাইল।

— ''না'', বলে অর্পিতা একটু চুপ করে রইল, ''আসলে আমরা এক জায়গা থেকে বাসে করে ধর্মতলায় এসে নামছিলাম। হঠাৎ এই জমায়েতটা দেখে মনে হল যে আমাদেরও এতে অংশ নেওয়ার আছে। আমরাও পারি এই রুখে দাঁড়ানোর পাশে দাঁড়াতে। তাই যোগ দিয়ে ফেললাম। আসলে কি জানো পাপান, মেয়েদের শরীরটাকে সেই যে প্রথম থেকে একটু আলাদা ভাবা শুরু হয়েছে, তাতে হয়েছে কি, আস্তে আস্তে গোটা মেয়ে জাতটাকেই কেবল শরীর ভাবার অভ্যাস তৈরী হয়ে গেল। এ'সব কান্ড তাই জন্যই ঘটে''। পাপানের অবাক লাগল কথাগুলো শুনে। তবু সে বুঝতে পারল অর্পিতা কি বলতে চাইছে। সে মাথা নেড়ে বলল, ''হ্যাঁ, ঠিকই''।

— ''দেখুন না'' পাপান একটু দম নিয়ে শুরু করে, কথা বলতে এখন ভালো লাগছে তার, মনে হচ্ছে যে সেও এই মুহূর্তে একটা নির্দিষ্ট কারণের জন্য বাঁচছে, কিছুক্ষণ আগেও তার মনে হতাশার যে বীজগুলো মাথা ঠেলা দিচ্ছিল, তারা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, ''এই পার্ক স্ট্রিটেই কি হল। ভদ্রমহিলার প্রতি অন্যায়টা নিয়ে যতনা কথা বলল মানুষ, তাঁর চরিত্র নিয়ে কথা হল তার চেয়ে বেশী। যেন একটি মানুষের চরিত্রের উপর নির্ভর করে যে তার উপর সমাজ কতটা অত্যাচার করতে পারবে''।

অর্পিতা একটু চুপ করে রইল, যেন কিছু একটা বলতে চায় অথচ ভাবছে বলবে কিনা। অর্পিতা পাপানের চোখের দিকে সরাসরি তাকাল এবার, ''পাপান, তুমি যখন আমাকে চেনো, তখন নিশ্চয় আমার অতীতটাকে ও চেনো। একটা কথা ভেবে দেখো, এই যে পার্কস্ট্রিট, কামদুনি বা আজকের ইস্যুটা নিয়ে এত কথা হচ্ছে এ'শহরে, এত আন্দোলন ভালো কথা, কিন্তু কলকাতা শহরের নামকরা অন্ধকার গলিগুলোতে এমন কত কামদুনি, পার্কস্ট্রিট ঘটে যাচ্ছে যে রোজ, কই তা নিয়ে তো কোনও প্রতিবাদী স্বর ওঠেনা ? কেন ? আমরা হাত পেতে দুটো পয়সা নিই বলে ? কিন্তু সে কি স্বেচ্ছায় ? তাছাড়া দুটো পয়সা দিলেই কি জোর করে এ'ভাবে কাউকে ভোগ করা যায় ? তাহলে কামদুনির মেয়েটির পরিবার কে সরকার চাকরি দিতে গেলে আমরা রে রে করে উঠি কেন ?''

পাপান হতবাক হয়ে যায়। এভাবে তো কখনও ভেবে দেখেনি সে। চিরকাল সে এইটুকুই জেনে এসেছে যে ও গলিগুলোতে যা ঘটে তা অন্যায়, কিন্তু ঘটনার আড়ালের ঘটনাটা আজ চোখের সামনে এইভাবে ভেসে উঠতে পাপান দিশাহারা হয়ে গেল।

শীর্ষর নজর এড়াল না পাপানের মুখের অভিব্যক্তিটা। ''আহ। ও বাচ্ছা মেয়ে, ওকে আবার এ'সব বলছ কেন অর্পিতা ?'' শীর্ষ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করল।

— ''ও বাচ্ছা বলেই তো বলছি'', অর্পিতা উত্তর দিল, ''ও এখন নিজের একটা মতামত গড়ে তুলছে পৃথিবী সম্বন্ধে, ঠিক ভুলগুলো বিচার করতে শিখছে। এটাই তো সময় ওকে বলবার যে মেয়েরা মেয়ে নয়, মেয়েরাও মানুষ। ও অনেক কিছু

এখন দেখবে-জানবে, অনেকেই অনেক কথা বলবেন ওকে, আমি না হয় আমার টুকু একটু বললামই । কেন শীর্ষ ? তুমি দেখোনি, আমাদের দুর্বার কমিটির ছেলেগুলোর বয়স কত ? ওর চেয়ে সামান্যই বড় হবে । অথচ কেমন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, আমাদের নিজেদের মানুষ বলে ভাবতে শিখিয়েছে । কি স্বার্থ গো ওদের ? কিছুই তো নয়, শুধু ওদের নিজস্ব বোধ ওদের টেনে এনেছে এই কাজে'' ।

শীর্ষ মাথা নাড়ে । কথাটা ঠিকই, সেও এখন একটু আধটু জড়াতে শুরু করেছে নিজেকে এদের কাজে । ''অর্পিতা দি'' পাপানের গলা বুজে আসছে, কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে পাপানের কেন কে জানে, ''আমিও আসব দুর্বারে মাঝে মাঝে, কাজ করব'' পাপান কোনওমতে কথাগুলো শেষ করে উঠে পড়ে, এবার হয়তো সামনে কেঁদে ফেলবে সে ।

পাপান মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলার মোড়ে এসে দাঁড়াল । তার জীবনও একটা মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে আজ । মনে মনে সে মোড়ের দিকে তাকিয়ে দেখল পাপান । কতকগুলো ছবি, নানা রঙের । রঙগুলো মাঝে মাঝে মিলে মিশে যাচ্ছে, আবার আলাদা হয়ে দাঁড়াচ্ছে মোড় থেকে শুরু হওয়া বিভিন্ন পথের মুখে । কতকগুলো অবয়ব, স্পষ্ট বোঝা যায়না, শুধু হালকা একটা আভাস পাওয়া যায় । কিছু কিছু যেন চেনা ও । ওই তো ইমনের মতো একটা অবয়ব, ক্রমশঃ কেউ আউট হয়ে যাচ্ছে সে অবয়বটা । কিছু মুখ খবরের কাগজে দেখা কুখ্যাত গলির মোড়ে, মিটিংয়ে, স্পষ্টতর হয়ে এসে ঘিরছে তাকে । বাপি ? বাপি কোথায় ? বোঝা যাচ্ছে না । তবে এই মুহূর্তে দুটো চেহারা হঠাৎ দু'দিক থেকে ছুটে এসে এক হয়ে গেল । চেহারা দুটোকে চিনতে পেরেছে পাপান, মা আর শিঞ্জিনি মাসি । পাপান নিজের মনেই হেসে উঠল । আশপাশের মানুষেরা চঞ্চল হয়ে উঠতেই পাপান টের পেল সামনের পথচারীদের সিগন্যালটা সবুজ হয়ে গেছে । এবার সে যেতে পারে সামনের দিকে । পাপান পথে পা বাড়াল ।

###

— ''ওরে শালা । এ তো বিপ্লব করে ফেলছিস রে । বিপ্লবের ধাক্কা সামলাতে পারবি তো ?'', জয় গজদাঁতটা বের করে হাসতে-হাসতে প্রশ্নটা ছোঁড়ে ।

''বিপ্লব মানে ?'', নীল অবাক হয়, ''বিপ্লব কিসের দেখলি এখানে ?''

— ''বিপ্লব নয় ? ঘোড়তর বিপ্লব রে, ঘোরতর বিপ্লব । ছিলি কর্পোরেট হাউসের টপ এক্সিকিউটিভ, ওর এক কথায় দশটা লোকের চাকরি গেল-চাকরি গেল ভাব, আজ হিল্লি কাল দিল্লি, যাকে বলে ফাটিয়ে দেওয়া । আর সেখান থেকে সব ছেড়ে ছুড়ে বাংলা ভাষার পাতি লেখক । অবাক হওয়ার কথা বইকি । তা হ্যাঁ রে, কর্পোরেট এক্সিকিউটিভরা তো ইংলিশে ম্যানেজমেন্টের বই লেখে, তুই কি লিখবি ?'', নীল বোঝে জয়ের চোখে কৌতুক খেলা করছে । আসলে জয় ইচ্ছা করেই খোঁচাচ্ছে তাকে, তার ইচ্ছার গভীরতা মাপতে চাইছে ।

— ''নারে জয়, ও'সব নয়, আসলে আমি একটা উপন্যাস লিখছি, সেটাতেই এখন মনটা পুরোপুরি দিতে চাই'', আসলে এই ডোমেনটাতেই আর থাকতে চাইছিনা আমি । ওই আবহ থেকেই বেড়িয়ে এসে নতুন একটা জীবনের ছোঁয়া পেতে চাইছি ।''

— ''হুঁ, বোঝা গেল'', জয়ের চোখে-মুখের কৌতুক গুলো উধাও হয়ে গেছে । তার জায়গায় এখন গম্ভীর একট ভাব । যেন খুব গভীর কিছু ভাবছে । জয় চোখ বুজে ফেলল । নীল এটাই চাইছিল । আসলে শুধু শিঞ্জিনি নয়, জয়ের সমর্থনটাও পাওয়া তার কাছে খুব জরুরী । জয়কে চিরকালই অন্য একটা চোখে দেখে এসেছে সে । আসলে কিছু কিছু মানুষকে আয়না মনে হয় যাদের কাছে নিজস্ব চিন্তা ভাবনা গুলো প্রতিফলিত হয়ে আরেক রূপে দেখা দিতে পারে । জয়, শিঞ্জিনি এরা নীলের জীবনের সেই আয়নাগুলো । জয়টা কিছুতেই আসতে চাইছিল না, সে নাকি ভীষণ ব্যস্ত কি এক ব্যাপারে । নীল অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আজ কফিহাউসে ধরে এনেছে ।

''কি রে চুপ মেরে গেলি ?'' নীল জানতে চাইল। জয় চোখ খুললনা। আরও কিছুক্ষণ ওইভাবে বসে রইল। তারপর যেন ঘুম থেকে উঠছে এমনভাবে ধীরে ধীরে চোখ খুলে খুব মৃদু স্বরে বলতে লাগল, ''আমি জানতাম। এমন একটা কিছু হবে তোর জীবনে, আমি জানতাম নীল। যে জীবনটা বাঁচছিলি, ওটা তোর বাঁচবার কথা নয়, ভুল করে বা বাধ্য হয়ে বাঁচছিলি। অবশেষে নিজেকে ভালো রাখবার সাহসটা স'য় করতে পেরেছিস। গুড, ভেরি গুড।''

নীল আগ্রহে এগিয়ে আসে, ''জয়, আমি তাহলে কোনও ভুল করছি না তো ?'' ঠিক করছি তো, যা করছি ?'' জয় চোখ দুটো দিয়ে হাসে, নীলের হাতের উপর আলতো চাপড় মারতে থাকে।

— ''নীল, তুই একটা খবর দিলি যখন, তখন তোকেও একটা খবর দিই। আমি কাটছি এখান থেকে'',

— ''কোথায় ? কাটছিস মানে ?'' নীল অবাক হয়ে যায়।

— ''কাটছি বলতে চললাম আসামের জঙ্গলের দিকে। ওখানে আদিবাসীদের নিয়ে অনেক কিছু করবার আছে রে। তোর ভাষায় গন্ডারের শিং গুনতে যেতে যেতে বুঝেছি, ভালো কাজ করতে গেলে ছড়িয়ে যেতে হবে। কলকাতায় বসে ওসব সেমিনার-টেমিনার করে লাভ নেই, একদম ওদের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। অনেকদিন তো বাঁচলাম রে একরকম করে, এবার একটু প্রাকৃতিক বাঁচি। বাড়ি-জমি সব বেচে দিলাম বুঝলি। ওগুলো নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম বলে আসতে চাইছিলাম না। আমার চেনা কিছু ভীষণ ভালো মানুষ আছেন এ'শহরে তাদের সব দায়িত্ব দিয়ে গেলাম। ওরা একটা ট্রাস্টি গড়বে এ টাকা দিয়ে। এ'রাজ্যের পথশিশুদের নিয়ে কাজ করবে ওই ট্রাস্টি। আমি মানুষগুলোকে চিনি। ওরা ঠিক পারবে।''

— ''তুই চিরকাল বড় অদ্ভুত বড় অন্যরকম থেকে গেলিরে জয়।'' নীল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে উঠল।

— ''অন্যরকম ?'' জয় অস্ফুটে বলল,'' জানিনা, শুধু জানি, আমি ভালো থাকা থেকে আরও ভালো থাকার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছি চিরকাল, যেমন এখন আবার করছি। আসলে জীবন তো একটা ট্রেনের মত, তাকে এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তবে এ'শহরের স্টেশন থেকে চলে যাওয়ার সময় একটা কথা মানতেই হবে। যাওয়ার আগে একটা মানুষকে মানুষের মতো জন্মাতে দেখে যাচ্ছি।''

— ''কাকে ?''

— ''তোকে রে তোকে। ভালো থাকিস'', নীলের গালে টোকা মেরে জয় উঠে পড়ে, ''আসি রে।''

নীল কিছুক্ষণ পরে কলেজ স্ট্রিটের উপর এসে দাঁড়ায়। হু হু করে শহরটা বয়ে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে তার কত নড়া-চড়া, কত বদলে নেওয়া নিজেকে। সবটা সব সময়ে চোখেও পড়েনা। শহরটা তার দৈনন্দিন জীবন যাপনের ফাঁকে টেরও পায়না অভ্যন্তরের সেই অমোঘ বিবর্তন। বোঝেনা, এ'শহরেই বদলে যাচ্ছে নীল, এ'শহর থেকেই চলে যাচ্ছে এ'শহর দাপানো জয়। সবার সবার জীবন কত বদলে গেল, সবার। গুন্ডা ভালো হয়ে যায়, গণিকা নতুন জীবন পায়, বিদেশ থেকে ফিরে আসা শিঞ্জিনি নতুন করে শ্রী হয়ে ওঠে। এ'শহরের আনাচে কানাচে এমন কত জয়, শিঞ্জিনি, শীর্ষরাই পাল্টে চলেছে, বদলে চলেছে নিজেদের আর নিজেদের জীবন, চেতন অবচেতনে। এ'শহর তা টেরও পায়না। সে ছুটে চলে, যা ঘটছে, যা ঘটে চলেছে সব কিছু ঘাড়ে নিয়ে সে এগিয়ে যায়। খালি দূর থেকে সব কিছু দেখে শুনে নিজের খাতায় সবটা লিখে রাখতে থাকে একজন — সময়।

কলকাতা শহরে রাত নেমে এসেছে। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে গোটা শহরটা। মাঝে মাঝে দু একটা বাইকের বিকট শব্দ আর দ্রুত গতিতে ছুটে যাওয়া গাড়ির চাকার আওয়াজ — এ'ছাড়া অন্য শব্দ খুঁজে পাওয়া মুশকিল এই মুহূর্তে। একটু দূরে একটা নাইট ক্লাব আছে। রাতের নৈঃশব্দ চিরে মাঝে মাঝে সেখান থেকে কোলাহলের শব্দ ভেসে আসছে। আগে রাত দশটা এগারোটা বাজলেই ঘুমিয়ে পড়ত শহর কলকাতা। এখন অবশ্য নতুন প্রজন্ম স্বাভাবিকতার সঙ্গে মাঝরাত পার করতে শিখেছে। শিঞ্জিনি একবার বলেছিল, আগে রাতের কলকাতা শাসন করত চার কবি যুবক, এই নিয়ে নাকি অনেক

মিথ আছে, আর এখন কলকাতার রাতের শাসনভার একদল বাইক আরোহীর হাতে যাদের এক পকেটে প্রচুর পয়সা থাকলে আরেক পকেট ভর্তি অভব্য আচরণে। এইসব ছেলে-মেয়েদের জন্যেই এখন কলকাতা জেনো রাত কাটাতে বাধ্য হয় যদিও এই বিষয়ে সাবালক হয়ে উঠতে এ'শহরের দেরী আছে। ইউরোপ অ্যামেরিকার নৈশ জীবনযাপন যা সে দেখে এসেছে, তার তুলানায় এ' কিছুই নয়।

আজ রাতে অনিন্দ্যও জেগে আছে। কোনও কোনও রাত মানুষের জীবনকে এমন সব প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়, টেনে আনে এমন সব পরিস্থিতি যে সে সব রাতে না ঘুমিয়ে দেনা-পাওনার হিসাবটা নিয়ে বসতে ইচ্ছা করে, ভেঙে ভেঙে আবার সব কিছু গড়ে নিতে চায় মন। রেনোভেশন। রেনোভেশন অব লাইফ ? ভিতটাকে একই রেখে জীবনের বাড়িটাকে নতুন ছাঁচে গড়ে নেওয়া। আসলে প্রতিটি রাস্তা বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রেক্ষাপট তৈরী করে দেয়, আর সেই প্রেক্ষাপটে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়া মানুষেরা যখন আবার কোন ও দিন কোনও গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে দাঁড়ায়, তখন বোঝা যায় যে এতদিন তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও এক রাস্তায় চলছিল বটে, কিন্তু আগামী মোড় থেকে সে'টুকুও থাকবেনা, তাদের রাস্তাগুলোও আলাদা হয়ে যাবে। তখন সে মোড়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে দোষারোপ করতে ইচ্ছা করে না, বরং মনে হয় নিজের পথটার পাশাপাশি অন্য পথটাকেও সম্মান করা উচিৎ, অন্য পথে যে গেল তাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাতে ইচ্ছা করে সেইসব মুহূর্তে। অনিন্দ্যর সংসারও আজ তেমনই এক মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে অনিন্দ্য কলকাতা শহরে চাকরি করতে এসেছিল। বড় অফার, বড় সুযোগ এ'সব তো ছিলই, কিন্তু কেরিয়ার পাগল অনিন্দ্যর মনে কোথাও নিজের মাটির জন্য একটা চোরা টানও ছিল কি ? অনিন্দ্য বুঝে উঠতে পারেনি সেটা কোনও দিনই। তবে যে কোনও কারণেই হোক এই ফেরাটায় খুব আগ্রহ ছিল তার, শিঞ্জিনির প্রবল অনাগ্রহ সত্ত্বেও তাই জোর করেই অনিন্দ্য চলে এসেছিল। বিদেশে থাকতে অনিন্দ্য খবর পেত যে তার শহর পাল্টে যাচ্ছে, নিজেকে আধুনিক চলমান বিশ্বের পাশে দাঁড়ানোর মত কর্মোপযোগী করে তুলছে। কিন্তু কোথায় কি ? ফেরবার কিছুদিনের মধ্যেই ধাক্কাগুলো খেতে শুরু করেছিল অনিন্দ্য। এত বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থেকে অনিন্দ্যর বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে এখানে তার পক্ষ্যে মানিয়ে নেওয়া কঠিন। কেরিয়ারের শুরু থেকেই বিদেশ চলে গিয়েছিল সে, একটা অন্য কর্মসংস্কৃতির মধ্যে নিজের গ্রুমিং করেছিল। আজ মাঝ বয়সে এই কর্মহীনতা আর উৎসাহহীনতার মধ্যে পড়ে অনিন্দ্যর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এ'দেশের কাজে-কর্মে গয়ংগচ্ছ ভাব, স্বপ্ন থেকে ভিশন, ভিশন থেকে নতুন নতুন চলবার উদ্যম, সেই উদ্যম থেকে আবার নতুন এক স্বপ্নের জন্ম নেওয়া — উন্নতির এই সমীকরণ থেকে এখনও অনেকটা দূরে তার শহর। অনিন্দ্য বুঝতে পারছিল যে এ'ভাবে বেশীদিন চলতে পারে না। এতে হয় সে অড ম্যান আউট হয়ে পড়বে কিছুদিনের মধ্যে, নয়তো নিজেকেও ওই গয়ংগচ্ছ ছাঁচে ফেলে শেষ করে ফেলবে। কিন্তু কেরিয়ার অনিন্দ্যর ধর্ম, অনিন্দ্যর প্যাশন। তার আর অন্য কোনও বাঁচা নেই, অন্য কোনও জীবনযাপন। অনিন্দ্য সব দ্বিধা কাটিয়ে তাই আবার ইউ.এস.এ তে রুটির সন্ধান করে ফেলেছে। সে ফিরে যাবে আবার, সেখানেই যেখানে তাকে মানায়। কিন্তু সেই মোড় ? সেই ছাড়িয়ে যাওয়া ? তাকে সে এড়াবে কি করে ? এ যে নিয়তির মত তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা সময় ছিল যেদিন শিঞ্জিনি ফিরে আসতে আপত্তি জানিয়েছিল, সেদিন অনিন্দ্যর জোরাজুরি টেনে এনেছিল তাকে দেশে। অথচ তখন ও'দেশে শিঞ্জিনির নিজস্ব এক পরিচিতি তৈরী হয়েছিল, অনিন্দ্যর থেকে স্বতন্ত্র এক পরিচিতি, সে পরিচিতির কোথাও অনিন্দ্যর অস্তিত্ব ছিলনা, সে পরিচিতি কোথাও ঘোষণা করতনা যে শিঞ্জিনি তার স্ত্রী। অথচ অনিন্দ্য সেদিন তা স্বীকার করতে চায়নি। আজ অনিন্দ্য বোঝে, সেদিন সে খালি নিজের টুকুই দেখেছিল, অন্য কারও কথা ভাবেনি, শিঞ্জিনির কথাও নয়। শিঞ্জিনিকে সেদিন নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে হয়েছিল তার। আজ অনিন্দ্যর ভাবতে ইচ্ছা করল, কেন সেদিন ওইভাবে শিঞ্জিনিকে সে জোর করেছিল ? নিজের কেরিয়ারের স্বার্থে তো বটেই। কিন্তু সেটাই কি সব ? নাকি মনের কোণে গোপন কাঁটার মত খচখচ করত শিঞ্জিনির সঙ্গে ওই অ্যামেরিকান কবিটির বন্ধুত্বটাও ? সেদিন অতটা মনে হয়নি, আজ এই বয়সে দাঁড়িয়ে অনিন্দ্যর কেমন যেন মনে হয় যে মনের অবচেতনে হয়তো এই ফ্যাক্টরটাও কাজ করেছিল। কিন্তু তাতে কি পেয়েছে অনিন্দ্য ? দেশে ফেরবার সিদ্ধান্তটা যে সম্পূর্ণ ভুল, সেটা আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার। তাই আজ আবার অনিন্দ্যকে ফিরে যেতে হচ্ছে সেই অন্য দেশে, আশ্রয় প্রার্থীর মত। কিন্তু শিঞ্জিনি ? দেশে ফিরে যতটা হারিয়েছে অনিন্দ্য, ঠিক ততটাই তো ফিরে পেয়েছে শিঞ্জিনি। আজ

সম্পূর্ণ অন্য একটা জীবন বাঁচে । সে যে অনিন্দ্যর স্ত্রী, এই বিষয়টি শিঞ্জিনি একটুও অস্বীকার করেনা তার আচরণে । একজন স্ত্রীর যা কর্তব্য তার স্বামীর জীবনে, সেখানে কোনও ত্রুটি রাখেনা শিঞ্জিনি । একদিক থেকে দেখতে গেলে তো হিসাবে কোথাও কোনও গরমিল নেই । অনিন্দ্য তো একজন স্ত্রী-ই চেয়েছিল জীবনে । কোনও রোমান্টিক ধ্যান-ধারণা থেকে তো শিঞ্জিনিকে বিয়ে করেনি সে । এ'কথা ঠিক যে শিঞ্জিনিকে ভালো লাগত তার, সেই ভালোলাগা থেকেই শিঞ্জিনিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল সে, কিন্তু তার সেই চাওয়ার পিছনে কি খালি ভালো লাগাই ছিল ? একটা হালকা ক্যালকুলেশনও কি ছিল না । শিঞ্জিনির শিক্ষা, বংশ-পরিচয়, তেমনভাবে না বুঝতে পারলেও শিঞ্জিনির চরিত্রের একটু অন্যরকমের ফ্লেভার এ'গুলোই কি মুখ্য কারণ ছিলনা অনিন্দ্যর নির্বাচনের পিছনে ? বোধহয় তাই । শিঞ্জিনি যদি এ'সব কিছুর অধিকারিনী না হত, তবে কি শুধু মানুষ হিসাবে তাকে নিজের জীবনে চাইত অনিন্দ্য ? অনিন্দ্যর আজ নিজেরই সন্দেহ হয় । এই যে এতগুলো বছর একসঙ্গে কাটিয়ে দিল তারা, কখনও শিঞ্জিনির ভিতরের মানুষটাকে দেখবার চেষ্টা করেছে সে ? না করেনি । বরং চোখের সামনে যে শিঞ্জিনিটাকে দেখা যায়, যে শিঞ্জিনিটা তার বউ — কেরিয়ারের ফাঁকে-ফোকরে তাকেই চেনার চেষ্টা করেছে সে । কিন্তু মানুষের মধ্যেও তো একটা মানুষ থাকে । শিঞ্জিনির ভিতরের সেই মানুষটাকে কখনও ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা তো করেনি সে । আজ অনিন্দ্যর মনে হচ্ছে, শুধু শিঞ্জিনি কেন, পৃথিবীতে কাউকেই কি সেইভাবে দেখতে চেয়েছে সে, এমন কি নিজেকেও ? না বোধহয় । দেখলে, আজ যে চিন্তাগুলো সে করতে পারছে, সেগুলো আরও কয়েকটা বছর আগে করতে পারত, নিজের জীবনের মানচিত্রটা অন্যরকম করে ফেলতে পারত । কিন্তু তা সে করেনি, খালি কেরিয়ার আর কেরিয়ার বুনো হাঁসের পিছনে অসম্ভব এক দৌড় । আজ যদি শিঞ্জিনি সে দৌড়ে আর সামিল না হতে চায়, আজ যদি শিঞ্জিনি বলে যে কলকাতায় তার বৃহত্তর কারণ আছে, তাহলে সে শিঞ্জিনিকে অন্ততঃ আজকের জায়গায় দাঁড়িয়ে দোষ দিতে পারবেনা ।

সত্যিই তো, শিঞ্জিনি এখানে ফিরে এসে এক অন্য জীবন গড়ে তুলেছে । সে জীবনটা ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারে না অনিন্দ্য সময় ও চর্চার অভাবে, শুধু আভাসই পেতে পারে, কিন্তু সে এ'টুকু বোঝে যে ওটা একটা অন্য পৃথিবী । ও পৃথিবীতে সোমদত্ত সেন ভদ্রলোকটির জায়গা হতে পারে, জঙ্গলমহলের জায়গা হতে পারে, কিন্তু অনিন্দ্যর কোনও জায়গা নেই । ঠিক যেভাবে একটা সময় অনিন্দ্য তার অন্য একটা জীবন গড়ে নিয়েছিল নিজের চরম আশাবাদী কেরিয়ারকে ঘিরে, ঠিক যেমন শিঞ্জিনি সে জীবনের দর্শক ছিল কম, কুশীলব নয়, ঠিক সেইভাবেই আজ শিঞ্জিনির গড়ে তোলা পৃথিবীতে ব্রাত্যজন হয়ে গেছে অনিন্দ্য । না, অনিন্দ্যর আজ আর সাহস, সম্বল কোনওটাই নেই শিঞ্জিনিকে তার সঙ্গে যেতে বলবার । কথা উঠেছিল, কিন্তু শিঞ্জিনি স্পষ্ট জানিয়েছে যে কলকাতার তাকে দরকার, সে অনিন্দ্যর সঙ্গে গিয়ে উঠতে পারবেনা । অনিন্দ্য আগের বারের মত জোর করতে পারেনি । কি আছে তার হাতে ? শিঞ্জিনির পছন্দসই কোনও কিছুই কি সে অফার করতে পারে তাকে ? সে সম্বল, সে অর্জন কোথায় তার ? কোন সাহসে সে শিঞ্জিনিকে জোর করে বলবে, চল ? যদি শিঞ্জিনি জানতে চায়, কেন ? যদি শিঞ্জিনি বসতে চায় পাওনা গন্ডার হিসাব নিয়ে ? অনিন্দ্য জানে সে হেরে ভূত হয়ে যাবে । না ভেতরে ভেতরে হেরে যাওয়াটা এ'ভাবে প্রকাশ্যে আনতে চায়না অনিন্দ্য । তাতে নিজের সামনে নিজেকে দৌড় করানোই মুশকিল হয়ে যাবে । তারচেয়ে সে নিঃশব্দ একলা ফিরে যাবে । বাবাইটা যেতে চায় তার সঙ্গে, বাবাই এর ধারণা ও' দেশে গেলে কেরিয়ারের সুবিধা পাবে সে । অনিন্দ্য লক্ষ্য করে দেখেছে, বাবাইয়ের মধ্যে তার কেরিয়ারিস্টিক অ্যাপ্রোচের অঙ্কুর পোঁতা আছে, তবু বাবাইকে কোনওরকম ভাবে সতর্ক করতে চায় না সে এর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়াগুলো সম্বন্ধে । এ' পৃথিবীর সবাই শিঞ্জিনির পৃথিবীতে বাস করতে পারেনা, বাস করা সম্ভব নয় । শিঞ্জিনির পৃথিবী মুষ্টিমেয় মানুষদের জন্য, আর তার, বাবাই এর মতো সাধারণ মানুষদের জন্য আছে সাধারণ এক পৃথিবী, যেখানে দেনা-পাওনার অংকটা সরল, যেখানে সাফল্য ব্যর্থতার মাপকাঠিটা সোজাসুজি । শিঞ্জিনির প্রতি কোনও অভিমান নিয়ে যাচ্ছেনা সে । সত্যি বলতে কি, প্রথম প্রথম একটু অভিমান ছিল তার, সফল পুরুষের ইগো খোঁচা মারছিল তাকে । কিন্তু যতদিন যাচ্ছে, অনিন্দ্য যেন সে'সব অভিমানের থেকে দূরে সরে যেতে পারছে । শিঞ্জিনির না যাওয়াটাকে সহজভাবে, নির্লিপ্তির সঙ্গে নিতে পারছে, আর যত তা পারছে, ততই তার মনে হচ্ছে, সে শিঞ্জিনিকে আজও ভালোবাসে, খুব ভালোবাসে । তার ছুটে চলার পথের ধুলোয় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল যে ভালোবাসা, আজ যেন তা নতুন ভাবে ধুলো ঝেড়ে বেঁচে উঠতে চাইছে । আজ, এত বছর পরে, তার শিঞ্জিনিকে গিয়ে হাত ধরে বলতে ইচ্ছা করছে, শিঞ্জিনি, আমি আমার মত করে তোমায় খুব ভালোবাসি । হয়তো ভালোবাসা কি, কেমন, সে'সব

ভালো করে জানিনা, তবুও ভালোবাসি । অনিন্দ্যর বলতে ইচ্ছা করছে, চলো শিঞ্জিনি, সব ছেড়ে-ছুড়ে আমরা আবার একসঙ্গে থাকি ফ্ল্যাটটাকে বাসস্থান নয় ঘর বানাই । কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে, বুদ্ধিমান অনিন্দ্য তা জানে । আজ তার আর শিঞ্জিনির ছায়া নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছায়া পথ সম্পূর্ণ দুটো আলাদা ব্রহ্মান্ড । ইচ্ছা থাকলেও শিঞ্জিনি আর নতুন করে কোথাও ফিরতে পারবেনা, ঠিক যেভাবে অনিন্দ্যও হারিয়েছে অন্য কোনও গ্যালেক্সির ঠিকানা । এ'জীবনটা এ'ভাবেই গড়াতে থাকবে বাকি পথে । চাপা হিসেব দিয়ে তৈরী সম্পর্ক আজ বড় বেহিসাবি হয়ে গেছে । সে হিসাব মেলানোর ক্ষমতা আর কারও নেই, অনিন্দ্যরও না, শিঞ্জিনিরও না । তাই চলেই যাবে অনিন্দ্য । শিঞ্জিনিকে তার আপন পৃথিবীতে স্বাধীন রেখে হাসিমুখে সে চলে যাবে তার চিরদাসত্ত্বের পৃথিবীতে । এই তার নিয়তি এই তার ডেস্টিনি, এই-ই তার হাতে পড়ে থাকা সবকিছু ।

শেষেরও শেষে যে কথারা রয়ে যায়

অনিন্দ্য চলে যাচ্ছে । শিঞ্জিনি রয়ে যাচ্ছে বিচিত্র সব টানাপড়েনের মধ্যে তিল তিল করে গড়ে ওঠা একটা পরিবার ছিটকে ছাটকে যাচ্ছে পৃথিবীর নানান প্রান্তে । কেন ? একেই কি নিয়তি বলে? নাকি নিয়তিকে ছোঁওয়ার পথে এ এক প্রাথমিক ও আবশ্যিক পা ফেলা মাত্র ? বলা মুশকিল । আসলে নিয়তি বলে কি কিছু হয় ? নাকি মানুষের জীবন যখন তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে বড়মাপের কোনও ঘটনা ঘটে যায়, তাকেই মানুষ নিয়তি নাম দিয়ে দেয় ? আসলে, জীবন তো একটা ট্রেনের মত যে ট্রেন সময়ের যাত্রাপথে ছুটে চলে প্রান্তিক স্টেশন মৃত্যুর দিকে । আর এই সময়ের রেললাইন ও তো অন্য কিছু নয়, তা চলমান ও ঘটমান কিছু মুহূর্তের সমষ্টি মাত্র । এইসব মুহূর্তের কিছু মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু হয়তো পারে না, কিন্তু মুহূর্ত পছন্দসই হলেও কয়েকটা মুহূর্ত নির্দিষ্ট মানুষের নির্দিষ্ট অপছন্দের তালিকাতে স্থান করে নেয় । তবু এইসব মুহূর্তই মানুষের জীবনে অবশ্যম্ভাবী । অবশ্যম্ভাবী এবং হয়তো আবশ্যকও কারণ এই নানা রঙ, নানা আকৃতি ও প্রকৃতির ফর্মেশনে জুড়ে জুড়ে তৈরী হয় জীবন নামের ট্রেনগুলো যে গুলো সময়ের একই রেলপথে চলতে চলতে সমানে লাইন বদল করতে থাকে, সরে যেতে থাকে এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে শুধুমাত্র অন্তিম স্টেশনটিকে ছোঁবে বলে ।

আমাদের উপন্যাসের অনিন্দ্য চলে যাচ্ছে । যাক কিন্তু সময়, সময়কে গড়ে তোলা ছোট-বড় মুহূর্তরা তো আর শুধু আমাদের অনিন্দ্যকে সৃষ্টি করেনি, প্রতি মুহূর্তেই এই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সৃষ্টি হয়ে চলেছে আরও অনেক অনিন্দ্যরা, তাদেরই মধ্যে কোনও অনিন্দ্য হয়তো কোথাও যাচ্ছেনা, থেকে যাচ্ছে নিজের সঙ্গে সমঝোতা করে । আবার হয়তো ঠিক এমনভাবেই কোনও এক শিঞ্জিনি থেকে যাচ্ছে না আমাদের শিঞ্জিনির মত । সে চলে যাচ্ছে, জীবনে আরও একবারের মত ডানা গুটিয়ে নিচ্ছে কোনও এক বাধ্যবাধকতায় । আর ঠিক তখনই নিমেষে অন্যরকম হয়ে উঠছে ওই অনিন্দ্য আর ওই শিঞ্জিনিদের ঘিরে গড়ে ওঠা উপন্যাসগুলোর গড়ন । আসলে সময়কে যে মুহূর্তদের দিয়ে ধরা যায়, সেইসব মুহূর্তদের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা আছে, নাকি মানুষই চালিত হয় সেইসব মুহূর্তদের আঙুলের নাড়াচাড়ায় এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অনিন্দ্যদের যাওয়া না যাওয়া থাকা না থাকা । আসলে কোনও ঘটে যাওয়া অথবা না ঘটে যাওয়াই চূড়ান্ত নয় মানুষের জীবনে । ছোট বড়, হালকা-গভীর বিভিন্ন মুহূর্তেরা সময়ের যে ধারা রচনা করে চলেছে অবিরত, সেই ধারাতেই ভেসে চলে অসংখ্য অজস্র নীল, শিঞ্জিনি-জয়িতা, অনিন্দ্য, শীর্ষ পাপানের দল । এ ভাসায় যে মানুষ যে বাঁকে থমকে যাচ্ছে, সেখান থেকে তার গতিপথও অন্যরকম হয়ে উঠছে, একই সঙ্গে তার জীবনের লাভ-ক্ষতির খতিয়ানের গল্পটাও । আসলে এই আলাদা আলাদা গল্পগুলো তো আর অন্য কিছুই নয়, এক অনন্ত সময় প্রবাহের খন্ডিত প্রতিফলন মাত্র । সময়ের পথে মুহূর্তদের সঙ্গী করে যুগ যুগ ধরে মানুষের চলেছে, চলছে আর সেই চলার পথের পদচিহ্ন গুলোর মধ্যে থেকে কিছু পদচিহ্নকে চিহ্নিত করবার চেষ্টাটাই এই উপন্যাসের উপজীব্য । বলা মুশকিল, খুবই বলা মুশকিল যে এই উপন্যাস এখানেই শেষ হল নাকি দীর্ঘ এক গৌরচন্দ্রিকা ও পটভূমিকা সৃষ্টির পরে এখান থেকেই শুরু হল আদতে গল্পটা । ঠিক তেমনভাবেই বলা কঠিন এই উপন্যাসের মানুষ জনেরা তাদের জীবনের গল্পের ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছল নাকি বেসক্যাম্প থেকে চড়াই ভেঙে সবে ওঠা শুরু করল ক্লাইম্যাক্সের এভারেস্টে। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার দায় যেমন পাঠকের নেই, খুব

সম্ভবতঃ লেখকেরও নেই। আমরা সবাই কেবল স্থির হয়ে বসে দেখতেই পারি যাবতীয় নড়া-চড়া আমরা খালি ঘটনার নুড়ি-পাথর গুলো নিয়ে খেলা করতে করতে দেখতেই পারি একটা প্রবাহের গড়িয়ে যাওয়া, মানুষ যার নাম রাখে 'সময়'।

একমাত্র সময়ই জানে সব কিছু, একমাত্র সময়ই সব ভাঙা-গড়ার মধ্যে অবিচল একমাত্র সে-ই যোদ্ধার মত বুক আর প্রেমিকের মত কোমলতা পেতে পারে নিজের গমনপথে — কারণ কোনও মানুষ না, কোনও চরিত্র নয়, জীবনের মত এ' উপন্যাসেরও স্বাভাবিক ও একমাত্র মুখ্য চরিত্র সেই-ই।

–:: (সমাপ্ত) ::–

সৌমিত্র চক্রবর্তী — পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

ধারাবাহিক উপন্যাস

স্বপ্না মিত্র

পাহাড় চুড়ো

পর্ব ২ ও ৩

নির্ধারিত সময়ের পনেরো মিনিট আগেই সোমনাথ পৌঁছে গিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। সিদ্ধার্থ এলো দশ মিনিট লেটে। ফলে যে ট্রেনটা তাদের ধরার ছিল, সেটা মিস হয়ে গেল।

তবে আজ সিদ্ধার্থ সোমনাথের অতিথি, তাই সোমনাথ কোনরকম অসন্তোষ প্রকাশ করলো না। আর কলেজের দু-বছরের জুনিয়র ছেলেকে 'সরি' বলা সিদ্ধার্থর ধাতে নেই। তাই দেরি করে এসেও সিদ্ধার্থ তার দাদাসুলভ ঢঙে সোমনাথের পিঠে চাপড় মেরে বলল, "আরে, বেড়াতেই তো যাচ্ছি, পরীক্ষা দিতে তো নয়, ওয়ান ট্রেন হিয়ার এন্ড দেয়ার ডাজ নট ম্যাটার।"

সোমনাথ মৃদু হাসে, "ঠিক আছে। তবে বাড়ি পৌঁছাতে রাত হয়ে যাবে, তখন অন্ধকার রাস্তায় অসুবিধে হলে আমাকে দোষ দিও না।"

পরের ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দিতেই সোমনাথ তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে জানলার ধারে পাশাপাশি দুটো সিট রাখলো।

জানলার পাশের সিটটা দেখিয়ে সোমনাথ বলল, "সিদ্ধার্থদা, এখানে বসো। ট্রেন যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকে মুখ করে বসতে হয়, তাহলে হুড়হুড় করে হাওয়া লাগে গায়ে।"

সিদ্ধার্থ অবশ্য সোমনাথের কথা শুনলো না, সে উল্টোদিকের সিটে বসে হেসে বলল, "তুই ছোট, জানলার ধারের সিটে বসে তুই-ই হাওয়া খা। আর হ্যাঁ, এটা সরকারের ট্রেন, এখানে তোর আতিথেয়তা দেখানোর কোন দরকার নেই, বুঝলি?"

সোমনাথ জানে সিদ্ধার্থদা মানুষটাই এমন, ট্যাঁসট্যাঁসে কথা, ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল, কখন কী যে চায় সহজে বোঝা যায় না। সে আর কিছু না বলে জানলার সামনে দাঁড়ানো চা-ওয়ালার থেকে দু-ভাঁড় চা কিনে এক ভাঁড় ধরিয়ে দেয় সিদ্ধার্থর হাতে।

ট্রেন ছাড়ে। ধীরে ধীরে পিছনে সরে যেতে থাকে হাওড়া, লিলুয়া, বেলুড়, বালি, উত্তরপাড়া ... দু-পাশের প্রকৃতি ক্রমশ হয়ে ওঠে সবুজ থেকে আরও ঘন সবুজ। ওই যে ঝাঁকড়া আমগাছ, তার পাশে সবজেটে জলের ডোবা, ডোবার অনতিদূরে তিন-চারটে ছাগল মনের আনন্দে ঘাস খাচ্ছে। দূরে যতদূর চোখ যায় শুধু ধুধু ধানক্ষেত, সেখানে লাঙল চালাচ্ছে চাষি। ওই যে, এক ঝাঁক টিয়া ডানা মেলে উড়ে গেল নীল আকাশে। এই যে, রেল-পোস্টের তারের ওপর ল্যাজ ঝোলা ফিঙে পাখি বসে।

আজ ট্রেনে তেমন ভিড় ছিল না, হুহু হাওয়ায় উড়তে উড়তে দুজনেই ডুব দিয়েছিল প্রকৃতির রূপে। ট্রেন মেমরি স্টেশনে ঢুকছে দেখে এতক্ষণে সোমনাথ নড়ে বসলো, হাতঘড়িতে সময় দেখে বলল, "যাক বাবা, ট্রেন সময়মত পৌঁছে গেছে, কোথাও অযথা থামেনি।"

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক তাকালো সিদ্ধার্থ, জিজ্ঞাসা করলো, "এই তোর মেমরি ? তবে যে বলেছিলি মেমরি খুব বড় স্টেশন ?"

সোমনাথ হেসে ফেলে, "একবার গ্রামের ভিতরে চলো, তখন বুঝবে গ্রামের মানুষদের জন্য মেমরি স্টেশন সত্যিই কত বড়।"

অনেক প্ল্যান করে সোমনাথের সঙ্গে সিদ্ধার্থ এসেছে গ্রামে বেড়াতে। তবে ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে মেমরি স্টেশনের ছিরিছাঁদ দেখেই তার উৎসাহে যেন জল পড়লো।

সিদ্ধার্থর দমে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে সোমনাথ ফিচেল হাসি হাসে, "ট্রেনে বসে রেললাইনের দু-পাশের সবুজ প্রকৃতি দেখে এই তো বলছিলে 'আবার আসিব ফিরে, ধানসিঁড়িটির তীরে', তা আবার আসবে তো সিদ্ধার্থদা?"

সিদ্ধার্থ দ্রুত দু-হাত নেড়ে নিজের অনুৎসাহ ভাব উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, "চল চল, তাড়াতাড়ি বাইরে চল। এখান থেকে ঘণ্টা খানেকের বাস জার্নি, তাই না?"

স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাস-স্ট্যান্ডের দিকে যেতে যেতে সোমনাথ বলে, "ইয়েস সিদ্ধার্থদা। বাস জার্নির পরে গরুর গাড়িতে অ্যানাদার ওয়ান এন্ড হাফ আওয়ার। তোমার টায়ার্ড লাগছে না তো?"

এইবার ফিচেল হাসি হাসে সিদ্ধার্থ, "টায়ার্ড লাগলেই বা কী, বাসের বদলে মার্সিডিজে নিয়ে যাবি নাকি? একবার বেরিয়েছি যখন আর তো উপায় নেই ভায়া, সুকুর গ্রাম দেখেই তবে কোলকাতায় ফিরবো।"

মেমরি স্টেশনের বাইরেই বাস-স্ট্যান্ড। বাস-স্ট্যান্ডে পৌঁছে সিদ্ধার্থর মুখের হাসি সত্যি সত্যিই উবে গেল। আর বাসে উঠে তো তার পুরো চক্ষু চড়কগাছ অবস্থা, সিদ্ধার্থ কোনমতে বলল, "বাসের সিটগুলোর কী অবস্থা রে! এখানে এই ভাবে লোকে যাতায়াত করে ?"

কোলকাতার অভিজাত অঞ্চলের বাসিন্দা সিদ্ধার্থর সামনে নিজের বাসস্থানের দৈন্য উন্মোচিত হয়ে যেতে এত ক্ষণে সোমনাথের কেমন অস্বস্তি লাগে। সে বলে, "তোমার লাক খারাপ সিদ্ধার্থদা, প্রতিদিন এই লাইনে এত লজঝড়ে বাস থাকে না। নতুন বাসগুলো বোধহয় সার্ভিসিং করতে পাঠিয়েছে। পনেরো দিন আগে ঘুরে গেলাম, তখন কিন্তু এরকম ভাঙা সিটের বাস পাইনি।"

সোমনাথের কথা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় এক চাষি পরিবারের আগমনে। চাষি, তার স্ত্রী আর সাত-আটটা বাচ্চা ঝপাঝপ উঠতে থাকে বাসে। মহিলা একেবারে সোমনাথ আর সিদ্ধার্থর ঘাড়ের ওপর এসে বসে। রোগা কালো মহিলাটির কোলে পুঁচকে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে সোমনাথ মনে মনে প্রমাদ গোনে। এই রে, এক্ষুনি যদি বাচ্চাটা কেঁদে ওঠে ! আর রোদন রত শিশুকে সামলানোর চেষ্টায় ব্লাউজের হুক খুলে দেয় এই মহিলা!

তবে সেরকম কিছু ঘটে না, বরং বাসের দুলুনিতে দু-মিনিটের মধ্যেই শিশুটি মায়ের বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘণ্টা খানেক চলার পরে বাস পৌঁছায় একটা চৌমাথায়। সেখানে সিদ্ধার্থকে নিয়ে সোমনাথ বাস থেকে নামে। চৌমাথার বাস স্ট্যান্ডের পাশেই সাইকেল রিপেয়ারিং শপ, সেখানে গ্রামের মানুষ সাইকেল জমা রেখে বাস ধরে শহরে যায়, আবার ফেরার পথে দোকান থেকে সাইকেল নিয়ে বাড়ি ফেরে।

সাইকেল রিপেয়ারিং শপের পাশে একটা গুমটি ঘরের মত ছোট্ট চায়ের দোকানও আছে, সেখানে পান, বিড়ি, সিগারেট বিক্রি হচ্ছে।

বাস থেকে নেমে দু-দিকে দু-হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙে সিদ্ধার্থ, বলে, "বলিহারি জার্নি রে! হাড়-মুড়মুড়ি রোগ ধরে গেল মাইরি। ভিতরটা পুরো নড়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে।"

চায়ের দোকানের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সোমনাথ বলল, "গরুর গাড়িতে ওঠার আগে চলো একটু গলা ভিজিয়ে নিই। আর তোমার স্টকে সিগারেট আছে তো? নাহলে দু-প্যাকেট নিয়ে নেব।গ্রামের ভিতরে ওসব সহজে পাওয়া যাবে না।"

এত ক্ষণে সিদ্ধার্থ খেয়াল করে, চায়ের দোকানের অদূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা গরুর গাড়ি।

গরুর গাড়ির প্রতি আঙুল দেখিয়ে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করে, "আমরা কি ওই গাড়িতে চড়ে যাবো ?"

সোমনাথ ঘাড় নাড়ে, "হ্যাঁ, ওটা আমাদের নিজস্ব গরুর গাড়ি সিদ্ধার্থদা, গাড়োয়ানও আমাদের নিজেদের।"

সিদ্ধার্থ হা-হা করে হেসে ওঠে, সোমনাথের পিঠে একটা চাপড় মেরে বলে, "মাইরি, নিজেদের ড্রাইভার থাকে জানি, নিজেদের গাড়োয়ানও যে থাকে এই প্রথম শুনলাম।"

সোমনাথের গলা গম্ভীর শোনায়, "অথচ কোলকাতা থেকে বর্ধমানের জিওগ্রাফিক্যাল দূরত্ব এমন কিছু বেশি নয় সিদ্ধার্থদা।"

চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে তারা চা খাচ্ছিল, চারপাশের সবুজ আর খোলা নীল আকাশের দিকে চোখ রেখে সিদ্ধার্থ বলে, "সেটাই, সেটাই আমাদের পত্রিকার টার্গেট, বুঝলি। কোলকাতা থেকে বর্ধমান হয়ে দার্জিলিং অবধি খবর থাকে আমাদের পত্রিকায়। অনেকদিন আগে বর্ধমানের ওপর একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম, পাঠকের প্রশংসাও পেয়েছিলাম খুব।"

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করে, "গরুর গাড়ি চড়ার অভিজ্ঞতা আছে না কি তোমার ?"

"না রে। গরুর গাড়িতে ভ্রমণ টোটালি নিউ ফর মি। তা গরুর গাড়িতে এখান থেকে তোদের বাড়ি পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে ?"

"এই চৌমাথা থেকে আমাদের বাড়ি পৌঁছাতে দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যায় সিদ্ধার্থদা। বাস রাস্তা থেকে ভিতরে ঢুকে প্রথমে কিছুটা খোয়া ঢালা পথ, তারপর বেশিটাই মাটির। মাটির রাস্তা এবড়োখেবড়ো, জায়গায় জায়গায় আস্ত বা ভাঙা ইট পরপর পেতে রাখা। এখন ভাদ্র মাস, শুকনো রাস্তা। বর্ষাকালে রাস্তায় যেখানে বেশি জল জমে, কাদা কিছুতেই শুকোতে চায় না, সেখানে এরকম ইট পেতে দেয় গ্রামবাসীরা। তাতে পায়ে হাঁটা মানুষদের পথ চলতে সুবিধা হয়, কাদায় পিছলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে, জুতোও কম নোংরা হয়।"

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সিদ্ধার্থ ঘড়িতে সময় দেখে, পাঁচটা দশ।

সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, "এ কী রে, প্রায় দু-ঘণ্টার পথ, তার মানে বাড়ি পৌঁছাতে সন্ধ্যে হয়ে যাবেই। তা রাস্তাঘাট সেফ তো?"

তবে হিসেবের থেকে অনেক বেশি সময় লেগে গেল রাস্তায়। কারণ পথে দু-বার গাড়ি থামাতে হয়েছিল। ফলে সন্ধ্যে কী, তারা যখন গরুর গাড়ি চড়ে গ্রামে ঢুকছে, চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার, মাঠঘাট গাছগাছালির ওপর নিঃশব্দে ঘন কালো রাত নেমে এসেছে। এক বিন্দু আলো নেই কোথাও। পাথরের মত জমাট অন্ধকারে এক হাত দূরের জিনিসও ঠাহর করা যাচ্ছে না। একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ব্যতীত পশু, পক্ষী, মনুষ্যের কোন সাড়াশব্দ নেই।

হঠাৎ সেই দম বন্ধ করা নিস্তব্ধতার মাঝে গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো গাড়োয়ান, গলে তুলে বলল, "এইখানে নেমে যান বাবুরা। বাকি রাস্তা পায়ে হেঁটে চলে যান। সামনে রাস্তা খারাপ, গরু আর এগোবে না।"

গাড়োয়ানের আদেশ শুনে সিদ্ধার্থ আর্তনাদ করে ওঠে, "কী বলছে রে সোমনাথ! এই মাঠের মাঝে নামিয়ে দিলে এখন যাবো কোথায় ?"

সোমনাথ আশ্বাস দেয়, "ভয়ের কিছু নেই সিদ্ধার্থদা, এ রাস্তায় হামেশাই এমন হয়। গরু একবার বসে পড়লে বাকি পথ হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। তবে এখান থেকে আমাদের বাড়ি বেশি দূরে নয়, মিনিট দশেকের রাস্তা মাত্র।"

"মিনিট দশেক কম হল ! এখন ক'টা বাজে রে ? চারপাশে এত অন্ধকার কেন ? এর মধ্যেই কি গ্রামের সবাই ঘুমিয়ে পড়লো ? কোথাও কোন আলো নেই, শেয়াল-কুকুর, সাপখোপ, চোর-ডাকাত কত কী থাকতে পারে রাস্তায় !"

বিড়ি ধরানোর জন্য গাড়োয়ান দেশলাই জ্বেলেছিল, সেই আলোতে সোমনাথ হাতঘড়ি দেখে, সোয়া আটটা বাজে।

সোমনাথ বলে, "উরিব্বাস, সোয়া আটটা মানে তো অনেক রাত হয়ে গেছে এখানে। আমাদের গ্রামে এখন মধ্যরাত, সবাই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে। তেলের খরচ বাঁচাতে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের সঙ্গে গ্রামের জীবন বাঁধা থাকে সিদ্ধার্থদা।"

গরু আর যাবে না। ফলে গরুর গাড়ি থেকে নামতেই হল। আর গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় পা রেখেই সিদ্ধার্থ হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল প্রায়।

ভাগ্যিস পাশেই গাড়োয়ান ছিল, সে শক্ত হাতে ধরে ফেলে সিদ্ধার্থকে, বলে, "সাবধান বাবু। আপনারা হলেন শহরের মানুষ, সেখানে পাকা রাস্তা, কত আলো। এখানের রাস্তা কাঁচা, এবড়ো খেবড়ো, দেখে পা ফেলেন।"

সিদ্ধার্থর গলায় বিরক্তি, "ইমপসিবল! দেখবো কী করে, আলো থাকলে তো!"

গাড়োয়ানের মেঠো স্বরে মৃদু হাসি, "দাদাবাবুর পিঠটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন বাবু, দাদাবাবু চলবেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও চলেন। রাতের বেলা নতুন মানুষেরা এখানে এভাবেই পথ হাঁটে, এটাই নিয়ম।"

সোমনাথও সায় দেয় গাড়োয়ানের প্রস্তাবে। ঠিক হল তাদের দুটো ব্যাগ গাড়িতেই থাকবে। গাড়োয়ান গরু দুটোর ব্যবস্থা করে ব্যাগ পৌঁছে দেবে বাড়িতে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে শুরু হল পথ চলা, সোমনাথের পিঠ আঁকড়ে গ্রামের পথে সিদ্ধার্থর অভিযান।

অভিযানই বটে, প্রতিটি পদক্ষেপে সিদ্ধার্থর মনে হচ্ছিল এই বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে। অন্ধকার যে এমন নিকষ কালো, সিদ্ধার্থর তা জানা ছিল না। মাঝে মাঝে দু-চারটে জোনাকির ওড়াউড়ি ছাড়া আর কোন আলো নেই। জোনাকির আলো আর ঝিঁঝিঁ-পোকার ডাক সম্বলিত এ কোন জনমানব হীন প্রান্তরে এসে পৌছালো সিদ্ধার্থ!

সোমনাথ বলেছিল দশ মিনিটের পথ, কিন্তু সিদ্ধার্থর মনে হচ্ছিল সে যেন মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে। হাঁটছে তো হাঁটছেই, পথ আর শেষ হচ্ছে না, অন্ধকার চন্দ্রবোড়ার মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঠেসে ধরছে তাকে।

ঠিক সেইসময় কোথা থেকে চাঁদ উদয় হল আকাশে, নিঝুম নিস্তব্ধ অন্ধকার প্রকৃতির হাটে হাজার হাজার মাটির প্রদীপ জ্বলে উঠলো যেন। তখন ওই একফালি চাঁদের আলোকেই মনে হল কত আলো। সিদ্ধার্থর ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো আবার। এত ক্ষণে তার চোখেও অন্ধকার অনেকটা সয়ে এসেছে। সেই ক্ষীণ চাঁদের আলোতেই চারপাশ সে আবছা দেখতে পেল। ছড়ানো ছেটানো বসতি, বেশিরভাগই ছোট ছোট মাটির বাড়ি। পাকা বাড়িও আছে, তবে সংখ্যায় নেহাতই নগণ্য।

চলতে চলতে সিদ্ধার্থ আবার জোর হোঁচট খেল, আর একটু হলেই সে রাস্তার ধারের পুকুরে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।

সোমনাথ সাবধান করে, "রাস্তার দিকে মন দাও সিদ্ধার্থদা, কাল সকালে গ্রাম দেখো।"

সোমনাথের মা-বাবা জেগে ছিলেন। বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির পাশেই রাখা ছিল এক বালতি জল আর একটা মগ। কালো কুচকুচে মেঝের টানা বারান্দার কোণে দড়িতে ঝুলছিল লাল রঙের দুটো গামছা।

সোমনাথের দেখাদেখি সিঁড়ির পাশে জুতো খুলে রাখে সিদ্ধার্থ। বালতি থেকে মগে করে জল নিয়ে হাতমুখ-পা ধুয়ে বারান্দায় ওঠে। বারান্দার পাশ দিয়ে পরপর তিনটে ঘর। সোমনাথের পিছু পিছু একদম শেষ ঘরটাতে ঢোকে সিদ্ধার্থ।

ঘরের এক কোণে ঢিমে করে রাখা হ্যারিকেনের পলতেটা সোমনাথ বাড়িয়ে দিতেই প্রায়ান্ধকার ঘর ভরে উঠলো হাল্কা হলুদ আলোয়। ওইটুকু আলোতেই সিদ্ধার্থর চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠলো চারপাশের অবয়ব। ঘরটার আয়তন মন্দ নয়, খাটের সাইজও বেশ বড়সড়। এক পাশে রাখা একটা টেবিল-চেয়ার, টেবিলটা বইখাতায় ঠাসা। এত ক্ষণ গরুর গাড়ি চড়ে সিদ্ধার্থ আর পারছিল না, সোমনাথ কিছু বলার আগেই সে খাটে গা এলিয়ে দিল।

সোমনাথ বলল, "এটা আমার ঘর সিদ্ধার্থদা। পড়ার টেবিলের পাশে টুলের ওপর জলের কুঁজো আর গ্লাস রইলো, তেষ্টা পেলে খেও। খাটের মাথার দিকের জানলাটা খোলা, পায়ের দিকেরটাও খুলে নিও, ঘরে হাওয়া খেলবে। মশারির খুঁটগুলো লাগানোই আছে, শোয়ার আগে জাস্ট ফেলে দিও।"

সিদ্ধার্থর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে, "তোদের এখানে ম্যালেরিয়ার উপদ্রব আছে?"

সোমনাথের গলায় ঠাট্টার সুর, "আছে বৈকি। বাংলার গ্রাম, আর ম্যালেরিয়া নেই, তাই কখনও হয়? তবে সাবধানের মার নেই, আমার ব্যাগে ওডোমস আছে, ইন ফ্যাক্ট তোমার জন্যই বিশেষ করে সঙ্গে এনেছি। দরকার মনে হলে লাগিয়ে নিও।"

সিদ্ধার্থর যেন কিছু মনে পড়ে যায়, সে জিজ্ঞাসা করে, "অ্যাই, রাতে বাথরুম পেলে কোথায় যাব?"

নির্বিকার কণ্ঠে সোমনাথ বলে, "চেপে থেকো, মোরগ ডাকার পরই বাথরুম যাওয়া।"

সিদ্ধার্থ খিঁচিয়ে ওঠে, "চেপে থাকবো মানে? বিছানা ভাসাবো নাকি?"

একটু ভেবে সোমনাথ বলে, "ঠিক আছে, আমি পাশের ঘরে আছি। তেমন দরকার হলে ডেকো, কলতলায় নিয়ে যাবো।"

তাদের কথার মাঝেই দেওয়ালের গায়ে একটা ছায়া পড়ে, সোমনাথের বাবা এসেছেন খেতে ডাকতে।

খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে রান্নাঘরের এক পাশে মেঝেতে, কাঠের পিঁড়ি পেতে। সামনে প্রায় দেড়-ফুট লম্বা লোহার স্ট্যান্ডের মাথায় দিবদিব করে জ্বলছে একটা লম্ফ। লম্ফের মৃদু আলোয় অদ্ভুত আলো আঁধারের আবহ সৃষ্টি হয়েছে রান্নাঘরে। আয়োজন সামান্যই, ভাত, ডাল, তরকারি আর এক বাটি ঘন দুধ। সোমনাথের মা-কে আশেপাশে কোথাও দেখতে পায় না সিদ্ধার্থ। সোমনাথের দেখাদেখি সেও পা ভাঁজ করে পিঁড়িতে বসে খেতে শুরু করে।

পরদিন সকালে সোমনাথ গরম চা নিয়ে এসে যখন সিদ্ধার্থর ঘুম ভাঙাল, ঘড়িতে তখন সকাল আটটা, বাইরে ঝলমল করছে নরম রোদ্দুর, মাথার ধারের জানলার পাশে আগাছার মত বেড়ে ওঠা যুঁইফুলের ঝোপটার পাতাগুলো সকালের মৃদুমন্দ হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে। রাতের নিস্তব্ধ নিশ্চুপ গ্রামে শুরু হয়ে গিয়েছে জীবনের ব্যস্ততা, চারপাশ ভরে উঠেছে কোলাহলে। সোমনাথকে দেখে দু-বার আড়মোড়া ভেঙে বিছানায় উঠে বসে সিদ্ধার্থ।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করে, "কেমন আছ? রাতে ঘুম হয়েছিল? গায়ের ব্যথা কমেছে?"

সিদ্ধার্থ হাসিমুখে বলে, "গুড মর্নিং! থ্যাঙ্ক ইউ ফর হট টি। ইয়েস, গায়ের ব্যথা অনেকটা কম।"

সোমনাথ তাড়া দেয়, "গুড। তাহলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো, ব্রাশ করে ফ্রেশ হয়ে নাও। মা লুচি ভাজছে। ব্রেকফাস্টে গরম লুচি আর বেগুন ভাজা। খেয়ে বেরোই চলো। পুরো চত্বরে একটা রাউন্ড দিয়ে আসি। বেশি বেলা হলে রোদ চড়ে যাবে।"

সিদ্ধার্থর মধ্যে অবশ্য কোনরকম তাড়া দেখা যায় না, গ্রাম দেখার সাধ বোধহয় ইতিমধ্যেই তার মিটে গেছে। আয়েস করে গরম চায়ে চুমুক দেয় সিদ্ধার্থ, জানলার বাইরে চোখ রেখে বলে, "তোর ক্যালি আছে সোমনাথ, এমন অজ পাড়াগাঁ থেকে কী করে কোলকাতার এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পৌঁছে গেলি রে !"

গতকাল রাতে সিদ্ধার্থ অত বোঝেনি। আজ দিনের আলোয় সে খুঁটিয়ে দেখলো সোমনাথদের বাড়িটা।

রাস্তা থেকে ঢুকেই একটা চওড়া উঠোন। উঠোনের মাঝখানে তুলসী মঞ্চ। এক পাশে পাতকুয়ো, পাতকুয়োর সঙ্গে কপিকল লাগানো, তাই দিয়ে পাতকুয়ো থেকে জল তোলা হচ্ছে। পাতকুয়োর পাশে কলতলা। তার পাশে স্নান-ঘর। স্নান-ঘরে ছাদ নেই, তবে একটা চৌবাচ্চা আছে। উঠোনের অন্য দিকে গোয়াল ঘর। গোয়াল ঘরের পিছনে স্যানিটারি পায়খানা।

গেট দিয়ে ঢুকে উঠোন পেরিয়ে তিন ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে লম্বা বারান্দা। বারান্দা বরাবর পরপর তিনটে শোয়ার ঘর। তিনটে শোয়ার ঘরই পাকা অর্থাৎ ইট-সিমেন্টের। রান্নাঘর মূল বাড়ির লাগোয়া, তবে ভিন্ন দালানে। উঠোন থেকে একটু দূরে, কোনাকুনি অবস্থানে আর একটা পাকা ঘর আছে। সেখানে শুধু ধান, চাল রাখা হয়, মানে গোলাঘর আর কী। সোমনাথের বাবা-মা নিরামিষাশী, তাই বাড়িতে মুরগী রাখেন না।

সোমনাথদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা কাচা হলেও খোয়া ঢালা, ফলে বর্ষায় কাদা হয় না। তবে বাড়ির সামনের পথটুকুই, তারপর আবার মাটির রাস্তা। সোমনাথদের পাশের বাড়ির চিত্রও মোটামুটি একই, উঠোনে কয়েকটা মোরগ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক পাশে একটা ঝাঁকড়া নিম গাছ, গাছের নীচে খুঁটিতে দুটো ছাগল বাঁধা। অধিকাংশ বাড়িরই বাউন্ডারি ওয়াল নেই, তাই রাস্তা থেকেই ঘর গেরস্থালীর টুকরো টুকরো দৃশ্য চোখে পড়ে।

সোমনাথ বলল, "কতবার বলা হয়েছে, যে যার বাড়ির সামনের রাস্তায় খোয়া ঢেলে নাও, তাহলে বর্ষায় পথ চলার কষ্ট কমে। কেউ শোনেই না, আসলে টানাটানির সংসার তো, তার থেকে খোয়া ঢালার অতিরিক্ত পয়সাটুকু খরচ করতে গায়ে লাগে।"

সোমনাথের কথা সিদ্ধার্থ শোনে, তবে উত্তর দেয় না, রাস্তার বাঁ-দিকের বাড়িটার প্রতি আঙুল দেখিয়ে বলে, "দ্যাখ দ্যাখ, কত বড় একটা কাঠের গামলা।"

সেদিকে তাকিয়ে সোমনাথ বলে, "বিচালি মাখছে, গরুকে খেতে দেবে।"

মাটির রাস্তাটা সোজা এগিয়ে ডান দিকে ঘুরে যেতেই রাস্তার পাশে একটা বড় পুকুর, পুকুরের পাড়ে এক দল হাঁস, এইমাত্র জল থেকে উঠে গা ঝাড়ছে। একটা হাঁস আবার খুঁটে খুঁটে কীসব খাচ্ছে, গুগলি বোধহয়।

পুকুরের উল্টোদিকেও সরু মাটির রাস্তা, রাস্তার পাশে পরপর ভ্যারেণ্ডা গাছ। হঠাৎ সেই রাস্তায় দেখা গেল, কলসি কাঁখে এক মহিলাকে, পুকুরে জল নিতে আসছে।

সেদিকে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ ফিসফিস করে, "কোন এক গাঁয়ের বধূ ...।"

সোমনাথ হেসে ফেলে, "চুপ সিদ্ধার্থদা, শুনতে পেলে মুশকিল আছে, বাড়িতে এসে বাবাকে নালিশ করে যাবে।"

সিদ্ধার্থ বলল, "গ্রাম দেখা তো হল, চল ধানক্ষেতে ঘুরে আসি।"

সোমনাথ বলল, "চলো তাহলে। ধানক্ষেতে যাওয়ার রাস্তায় আমার জেঠুর বাড়ি। বাবা বলেছিল জেঠুর থেকে জমির দলিলটা নিয়ে আসতে, যাওয়ার পথে তাহলে তুলে নিই।"

সোমনাথের জেঠুর বাড়িতে সিদ্ধার্থ অবশ্য ঢুকল না, সোমনাথ একাই গেল ভিতরে। বাইরে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ জরিপ করছিল চারপাশ।

মনে হয় সোমনাথের জেঠুর আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। মূল বাড়িটা দোতলা, দু-পাশে ইটের গাঁথনির উঁচু পাঁচিল। ফলে বাড়ির আব্রু অনেকটা রক্ষা হয়েছে, সব কিছু রাস্তা থেকে দৃশ্যমান নয়।

সোমনাথ বলেছিল দু-মিনিটের ব্যাপার, কিন্তু জেঠুর বাড়ি থেকে তার বেরোতে লাগালো পুরো সাত মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড। সোমনাথের পিছন পিছন বেরিয়ে এলো তেরো-চোদ্দ বছরের এক কিশোরীও। কিশোরীর পরনে হাঁটুর নীচ অবধি ঝুলের ফুল ছাপ ঢোলা স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ। মাথার চুল দু-দিকে দুটো বিনুনিতে বাঁধা, বিনুনির শেষে লাল ফিতের ফুল। সিদ্ধার্থকে দেখে কিশোরী মেয়েটি আর রাস্তা অবধি এগিয়ে এলো না, বাড়ির দরজার ফ্রেমেই দাঁড়িয়ে পড়লো।

ধানক্ষেতের দিকে যেতে যেতে সোমনাথ বলল, "মেয়েটার নাম জিজ্ঞাসা করলে না সিদ্ধার্থদা ?"

সিদ্ধার্থর গলা নিরুৎসুক শোনায়, "প্রেম করিস নাকি ? তোর সঙ্গে যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে এলো !"

সোমনাথ মাথা ঝাঁকায়, "না না, একই গ্রামের মেয়ে, ছোট থেকে চিনি। তবে ওর নামটা ইন্টারেস্টিং।"

সিদ্ধার্থর স্বরে কৌতূহল ফুটে ওঠে, "কী নাম রে ?"

সোমনাথের চোখে হাসি, "তোমার খুব প্রিয়, বনলতা। তবে বনলতা সরকার।"

সোমনাথের পিঠে দুটো চাপড় মেরে সিদ্ধার্থ হো হো করে হেসে ওঠে, "খুব ফাজিল হয়েছিস তো !"

(৩)

ল্যান্সডাউন রোডের গা-ঘেঁষে তিনতলা গোলাপি বাড়িটার দোতলায় এখন ধুন্দুমার কাণ্ড চলছে। সেখানে পরিবারের সবচাইতে বয়স্ক সদস্যটি, সাতাশি বছরের প্রনবেশ দত্ত ব্যতীত প্রত্যেকেই ব্যস্ত। স্কুল, কলেজ, অফিস যাওয়ার তাড়া তাদের, সবারই কোন না কোন কারণে খালি দেরি হয়ে যাচ্ছে।

প্রনবেশ দত্তর মেজ ছেলে, বাড়ির কর্তা অবিনাশ দত্ত যান হাওড়ায়, বার্নস এন্ড মার্টিনে আছেন। অবিনাশের স্ত্রী প্রতিমা স্কুল-টিচার। অবিনাশ আর প্রতিমার একমাত্র ছেলে সিদ্ধার্থ ইউনিভার্সিটির নাম করে সেই যে সাতসকালে বেরোয়, ফিরতে ফিরতে তার রাত হয়ে যায়। ছেলের থেকে সাত বছরের ছোট, একমাত্র মেয়ে শাশ্বতী সদ্য ক্লাস ইলেভেনে উঠেছে, ব্রাহ্ম গার্লসের ছাত্রী, আর্টস নিয়ে পড়ছে।

প্রতিদিন সকালে এই ধুন্দুমারের সময় শাশ্বতীর গলা সবার ওপর দিয়ে যায়। এই মুহূর্তে তার মাথায় নীলাকাশ ভেঙে পড়েছে যেন, করকরে মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করা স্কুলের শাড়িটা এমন ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়েছে যে, সে কিছুতেই শাড়ির কুঁচি ম্যানেজ করতে পারছে না।

ওদিকে শোয়ার ঘরে তখন প্রতিমা নীল জমির চওড়া সবুজ পাড় তাঁতের শাড়ির সঙ্গে একটা জুতসই ম্যাচিং দুল খুঁজতে ব্যস্ত। শাশ্বতীর চিৎকারে উত্যক্ত হয়ে তিনি সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলেন, "মিঠুর শাড়ির কুঁচিটা ধরে দে তো চারু।"

তিরিশ বছরের পুরনো রাতদিনের কর্মসহায়িকা চারুবালা রান্নাঘরে ছিল। প্রতিমার উচ্চস্বরে তার কোন হেলদোল হল বলে মনে হয় না। সে নিজের মত ধীরেসুস্থে দুটো টিফিনবক্স প্যাক করে ডাইনিং টেবিলে রাখে, তারপর কিচেন টাওয়েলে হাত মুছতে মুছতে লম্বা করিডরের শেষে শাশ্বতীর ছোট্ট ঘরটার দরজার মুখে এসে দাঁড়ায়, দেখে, ঠিকে কাজের লোক

মঞ্জুকে দিয়ে ইতিমধ্যেই শাশ্বতী শাড়ির কুঁচি ঠিক করে নিয়েছে। এখন সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচল নিখুঁত করে পিন করতে ব্যস্ত।

সেদিকে তাকিয়ে চারুবালা বলে, "খুব হয়েছে, এইবার চুল বেঁধে নাও, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

চারুবালার উপদেশ অবশ্য গায়ে মাখে না শাশ্বতী, সে আয়নার দিকে মুখ রেখেই বলে, "যাও তো তুমি, আমাকে আমার মত সাজতে দাও। ওই শোনো, দাদা ডাকছে তোমাকে।"

শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চারুবালা ভাবে, এবাড়ির মেয়েদের রূপ আছে বটে! মিঠুদিকে দেখতে হয়েছে একদম ছোড়দির মত, ওইরকম গড়ন, চোখমুখ, গায়ের রঙ আর মেজাজ। শাশ্বতীর শাড়ি পরা হয়ে গিয়েছে দেখে চারুবালা আর দাঁড়ায় না, রান্নাঘরে ফিরে যায়।

মনের মত আঁচল পিন-আপ করে কাঁধের কাছে স্কুল-ব্যাজ লাগায় শাশ্বতী। চুল আঁচড়ায়। পনিটেল বাঁধার জন্য বাঁ-হাতে চুলের গোছা উঁচু করে ধরে ডান হাত দিয়ে কাঁকড়া-ক্লিপ লাগাতে যাবে, তার চোখ আটকে যায় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের প্রতি। ছিপছিপে শরীর, উদ্ধত স্তন, ক্ষীণ কটি, সমতল পেট। নিজের প্রতিবিম্বকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে শাশ্বতী। চুল বেঁধে লাল টুকটুকে ভরাট ঠোঁটে ভেসলিন লাগায়। টিপের পাতা থেকে ছোট্ট একটা লাল টিপ বের করে দুই ভুরুর মাঝখানে বসিয়ে দেয়।

সাজ সম্পূর্ণ হলে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরেফিরে আয়নায় নিজেকে দেখে সে, একটা ফ্লাইং কিস ছুঁড়ে দেয় হাওয়ায়। নট ব্যাড, সে নিজের মনে ভাবে।

শাশ্বতীদের বাড়ি থেকে সাতটা বাড়ি ছেড়ে লালরঙের দোতলা বাড়িটার সামনে একটা চওড়া রোয়াক আছে, কয়েকটা ছেলে সেখানে বসে সকাল বিকেল নিয়মিত আড্ডা দেয়। শাশ্বতী চেনে ছেলেগুলোকে। স্কুলে যাওয়া আসার পথে সে ওদের লক্ষ্য করে, ওরাও চেয়ে চেয়ে দেখে শাশ্বতীকে।

ছেলেগুলোর মধ্যে একজন আছে, দারুণ ম্যানলি চেহারা, প্রায় ছ-ফুট লম্বা, ঘাড় অবধি চুল, সবসময় জিনস আর হাওয়াই সার্ট পরে, সার্টের ওপরের বোতাম দুটো আবার খুলে রাখে।

ছেলেটাকে খুব ভালো লাগে শাশ্বতীর, ঠিক যেন সিনেমার হিরো। ছেলেটাও খুব দেখে শাশ্বতীকে। তবে ওই দেখা অবধিই। তাতেই স্কুলে প্রাণের বন্ধু গোপার কাছে সে কত গল্প করেছে হিরোবাবুর।

গোপাও যেন গল্প শোনার অপেক্ষায় থাকে, টিফিন টাইমে একটু আড়াল পেলেই শাশ্বতীকে চেপে ধরে, "কী রে, তার খবর কি? আজ কী রঙের সার্ট পরেছিল?"

ব্যস, ওই প্রশ্নটুকুর অপেক্ষা শুধু, শাশ্বতী গড়গড় করে বলতে শুরু করে হিরোবাবুর রোজনামচা। রোয়াকে পায়ের ওপর পা তুলে কেমন করে বসে থাকে, কী পার্ফেক্ট সিগারেটের ধোঁয়ার রিং বানায়, আর শাশ্বতীকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য কী যে করে! প্রতিদিন শাশ্বতীর স্কুল যাওয়ার সময় হিরোবাবু ঠিক হাজির হয় রোয়াকে, আর যতক্ষণ দেখা যায় শাশ্বতীকে, হিরো তাকিয়ে থাকে, তাকিয়েই থাকে।

গোপার আবার সব খুঁটিয়ে জানা চাই, সে জিজ্ঞাসা করে, "রোয়াক ক্রস করে যাওয়ার পরে হিরোবাবু তো তোর পিছনে, কী করে বুঝিস তোকে দেখছে?"

শাশ্বতী উত্তর দেয়, "আহা, আমি রোজই পিছন ফিরে চেক করে নিই।"

আয়নার দিকে চোখ রেখে নিজের মুখের পাশে হিরোবাবুর মুখটা কল্পনা করে শাশ্বতী, মনে মনে ভাবে তাদের দুজনের জুটিকে বেশ মানাবে।

শাশ্বতী খেয়াল করেনি, কখন যেন সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়িয়েছে তার ঘরের দরজার সামনে। একমাত্র ছোট বোনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সিদ্ধার্থ শাসনের ভঙ্গিতে বলে, "কী বিড়বিড় করছিস আয়নার দিকে তাকিয়ে ? তখন থেকে মা ডাকছে, শুনতে পাচ্ছিস না ?"

সবাই বেরিয়ে গিয়েছে। বাড়িতে আছে শুধু প্রনবেশ আর চারুবালা। দুপুরে একা প্রনবেশের জন্য রান্না, তবু ভাত, ডাল, তরকারি, মাছের ঝোল সবই তো করতে হয়।

চারুবালার রান্না হয়ে এলো প্রায়, মাছের ঝোল আরও একটু শুকোলেই এবেলার মত কাজ শেষ। দুপুরের খাবার ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করবে সে। তারপর স্নান। স্নানের পরে বিকেল চারটের আগে তার আর তেমন কোন কাজ থাকে না। মাঝে শুধু ঘড়ি ধরে দুপুর সাড়ে বারোটায় প্রনবেশকে ভাত বেড়ে দেওয়া, আর রুটিন মত ওষুধ হাতে ধরিয়ে দিতে হয়।

চারুবালা ইংরিজী পড়তে জানে না, তাই লাল, নীল, সবুজ কৌটোয় প্রনবেশের নিত্যদিনের ওষুধ গুছিয়ে রাখে প্রতিমা। কৌটোর রঙ দেখে চারুবালা ওষুধ দেয় প্রনবেশকে। সকালে লাল কৌটোর দুটো, নীল বোতলের একটা। দুপুরে সবুজ কৌটোর দুটো আর নীল বোতলের একটা। রাতে শুধু নীল বোতলের একটা।

স্নান সেরে বেরিয়ে বারান্দায় কাপড় শুকোতে দিচ্ছিল চারুবালা। ঝনঝন শব্দে টেলিফোন বেজে ওঠে ডাইনিং স্পেসে। এই সময় ফোন এলে চারুবালাই ধরে, ফোন ধরতে প্রনবেশ আর নিজের ঘর থেকে বেরোন না।

টেলিফোনের পাশে খাতা পেন্সিল রাখা আছে, দরকার মত ইনফরমেশন লিখে রাখে চারুবালা। তবে আত্মীয়স্বজন, বড়দা বা ছোড়দির ফোন এলে সে ডেকে দেয় প্রনবেশকে।

কাপড় শুকোতে দেওয়া অসমাপ্ত রেখে চারুবালা ভিতরে ঢুকে আসে, ফোন তুলে দেখে, ওপ্রান্তে ছোড়দি।

"কতক্ষণ রিং হয়ে যাচ্ছে, কোথায় ছিলে চারু?" ছোড়দির গলায় অসন্তোষ।

এই বাড়িতে টানা তিরিশ বছর কাজ করছে চারুবালা। অকারণে এঁদের বড়মানুষি মেজাজ এতদিনে তার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তবু আজ সে মনে মনে বিরক্ত হল। চারুবালা কাজ করে মেজদার ঘরে, ছোড়দির ভাবখানা যেন মাসের প্রথমে চারুবালাকে ছোড়দিও মাইনে দেয়।

শান্ত গলায় সে উত্তর দেয়, "বারান্দায় ছিলাম দিদি, তাই আসতে সময় লাগলো। মেসোমশাইকে ডেকে দেব ?"

ছোড়দির গলায় রাজ্যের তাড়া, "বাবার সঙ্গে পরে কথা বলছি, একবার নীচে যা চারু, আমাদের লেটার বক্স খুলে দেখ তো কোন চিঠি এলো কি না।"

প্রনবেশের ঘর থেকে আওয়াজ আসে, "কার ফোন চারু ?"

প্রনবেশের প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেয় না চারুবালা, শুধু গলা তুলে বলে, "আমি নীচে যাচ্ছি মেসোমশাই, লেটারবক্স চেক করতে, ইনকাম ট্যাক্স অফিস থেকে ছোড়দির নামে চিঠি এসেছে।"

ল্যান্সডাউন রোডের গা-ঘেঁষে এই তিনতলা গোলাপি বাড়িটা বহু পুরনো, প্রনবেশের বাবার তৈরি। অত দিন আগে তৈরি হিসেবে বাড়িটার ডিজাইন খুবই আধুনিক, বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায় প্রনবেশের বাবা বেশ মডার্ন সাহেবসুবো মানুষ ছিলেন।

তিনতলা বাড়িটা যেন তিনটে সেপারেট ফ্ল্যাট, প্রতিটি ফ্লোরের ডিজাইন হুবহু এক। প্রনবেশের তিন সন্তান, প্রথম দুই ছেলের পরে এক মেয়ে। বড় ছেলে অলকেশ, মেজ ছেলে অবিনাশ আর মেয়ে অলকা। প্রনবেশের বাবা বাড়িটা ছেলেকে নয়, তিন নাতি নাতনীকে উইল করে দিয়ে গিয়েছেন।

অলকেশ আর অলকা দুজনেই থাকে দেশের বাইরে, একা অবিনাশই আছে কোলকাতায়। তবে অলকেশ আর অলকা তাদের ভাগের ফ্ল্যাটে ভাড়া বসায়নি, তালা বন্ধ করে ফেলে রেখেছে।

একদিন অবিনাশকে প্রতিমা বলেছিল, "ওরা ডলারে রোজগার করে, ভাড়া দিলে কতই বা পাবে, ওই কটা টাকার কী মূল্য ওদের কাছে!"

অবিনাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, "তাই তো বলছি, তালা দিয়ে না রাখলে দরকার মত আমরা ব্যবহার করতে পারতাম। ছেলেটা বড় হচ্ছে, তার বন্ধুবান্ধব আছে, তারা বাড়িতে আসে, একটু প্রাইভেসি হলে ওদেরও ভালো লাগে।"

প্রতিমা বলে, "আমার ছেলের জন্য দরকার নেই। নিজেদের বাবার নাম করেও তো একটা ঘর খুলে রাখতে পারে।"

অবিনাশের আবার নিজের বংশজাত কোন মানুষের সমালোচনা অন্যের মুখে একেবারে সহ্য হয় না, সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "ঘর দেয়নি, তবে বাবার অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে মোটা টাকা তো পাঠায়। বাবুয়া আর মিঠুর টিউশনের টাকা এখনও বাবা দিয়ে যাচ্ছেন, সেই ঢের।"

প্রতিমার ভুরু কুঁচকে ওঠে, "বাবার নিজের পেনসনও আছে, আমার ছেলেমেয়েদের টিউশনের পয়সা বাবার পেনসন থেকেই হয়ে যায়। তাছাড়া টাকা পাঠানোই তো উচিত। বাড়ি, গয়না, রুপোর বাসন সবকিছুতেই সম্পত্তির সমান ভাগ নিয়েছে, তাহলে দায়িত্বের ক্ষেত্রে কেন নয় ? তিনশো-পঁয়ষট্টি দিন আমরা গতর খাটিয়ে বাবার দেখাশোনা করছি, ওরা তো শুধু অর্থই দেয়। অপর্যাপ্ত আছে, তার থেকে দু-আনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দায় সারে।"

এইবার অবিনাশ রেগে যায়, "অশিক্ষিতর মত কথা বল না প্রতিমা। মা-বাবা নিয়ে ভাগাভাগি আমাদের বংশে নেই। অলকার কথা ছেড়ে দাও, ওর স্বামী মানস মানুষটাই ওরকম, কিপটে আর ধান্দাবাজ। কিন্তু দাদাকে দেখো, ধমনীতে জমিদার বংশের রক্ত বইছে বোঝা যায়। কী দরাজ হাত বল তো! এই বাড়ির কোন জিনিসই আমার কেনা নয়। টিভি, ফ্রিজ, গিজার সবই তো বড়দার দেওয়া। এমনকী টেলিফোন লাইনের কানেকশনও বড়দাই উদ্যোগ করে এনেছিল।"

প্রতিমার গলাতেও রাগ ফুটে ওঠে, "আমরা বাঙাল, আমার বাবা স্কুল টিচার ছিলেন, আমাদের গড়িয়ায় বাড়ি, তাই কত সহজে শিক্ষা তুলে কথা বলে দিলে! সর্বক্ষণ অত জমিদার বংশের বড়াই, তাও যদি সেই জমিদারির কিছু অবশিষ্ট থাকতো। ধড় না হোক, ল্যাজটুকুও তো সারা জীবনে দেখলাম না।"

প্রতিমাকে রাগতে দেখে পরিস্থিতি সামলাতে অবিনাশ হেসে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, "তোমরা তো আমাদের থেকে উঁচু জাতের গো! আমরা হলাম দত্ত, আর তোমরা সেনগুপ্ত। তা কায়েতদের থেকে বদ্যিরা কি উঁচু জাতের নয় ?"

আজ দিনটা বড় বিস্বাদ কেটেছে শাশ্বতীর। সকালে এত সেজেগুজে স্কুলের জন্য বেরোলো, কিন্তু পুরোটাই বৃথা, হিরোবাবু আজ রোয়াকে ছিল না। যথারীতি টিফিন টাইমে গোপা জিজ্ঞাসা করেছিল হিরোর খবর, শাশ্বতীকে বানিয়ে বানিয়ে উত্তর দিতে হয়েছে।

যাহ্, গোপাকে বলা যায় নাকি যে আজ হিরো রোয়াকে আসেনি। গোপার তো ধারণা সুন্দরী শাশ্বতীকে একবার চোখের দেখা দেখতে হিরোবাবু চব্বিশ-ঘণ্টা রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে থাকে।

স্কুল থেকে ফেরার সময়ও শাশ্বতীর মন ভার হয়ে ছিল। তবে দূরে হলেও, বাস থেকে নেমেই সে ঠিক দেখতে পেয়েছে। ঘাড় অবধি চুল, নীল সাদা ফুল ছাপ সার্ট পরনে হিরোবাবু বাস-রাস্তার পাশ দিয়ে সাবধানে সাইকেল চালিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

হিরোকে দেখে শাশ্বতীর বুকের ভিতরটা ধকধক করতে শুরু করে, আর হৃৎপিণ্ডটা এক লাফে গলার কাছে আটকে যায়, যখন হিরো পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সুট করে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দেয় তার হাতে।

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে শাশ্বতীর পুরো কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। সে বুঝে পায় না চিঠিটা নিয়ে কী করবে, কোথায় রাখবে। শুধু তার হাঁটার গতি দ্রুত হয়ে যায়, কোনরকমে বাড়ির দরজা অবধি পৌঁছে সজোরে কলিং বেল টেপে। সবুজ রঙের প্রবেশ দরজাটার সঙ্গে গা মিশিয়ে আপাতত সে চিঠিটা চালান করে দেয় ব্লাউজের ভিতর, উদ্ধত দুই স্তনের খাঁজে।

শাশ্বতী স্কুল থেকে ফেরার আগে বিকেল চারটে নাগাদ প্রতিমা বাড়ি চলে আসে।

আজ মেয়েকে দেখে প্রতিমার কপালে ভাঁজ পড়ে, "তোর কি শরীর খারাপ মিঠু ? মুখটা এত লাল দেখাচ্ছে কেন ?"

শাশ্বতী অবশ্য প্রতিমার চোখে চোখ রাখে না, প্রশ্নেরও উত্তর দেয় না, সোজা নিজের ঘরে ঢুকে খিল তুলে দেয় দরজায়।

মেয়ের ব্যবহারে প্রতিমা অবাক হয়, বিরক্তও লাগে, তবে বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করে না, যা মেজাজ এইটুকু মেয়ের! শুধু বলে, "দরজা বন্ধ করলে কেন মিঠু ? হাতমুখ ধুয়ে আগে খাবার খেয়ে নাও, তারপর জামাকাপড় চেঞ্জ করো।"

দরজায় খিল তুলেই শাশ্বতী স্যাট করে ব্লাউজের ভিতর থেকে চিঠিটা বের করে আনে, পড়ার টেবিলের তিন নম্বর ড্রয়ারে কাগজপত্রের নীচে চালান করে দেয়।

প্রতিমার কথা শেষ হয় না, দরজা খুলে বেরিয়ে আসে শাশ্বতী, এর মধ্যেই তার মুখের লালচে ভাব উধাও হয়ে আবার স্বাভাবিক রঙ ফিরে এসেছে।

মেয়েকে লক্ষ্য করে অবাক হয় প্রতিমা, তবে কিছু বলে না, এখন তার অনেক কাজ।

দু-বেলার রান্না চারুবালা করলেও বিকেলের জলখাবার প্রতিমা নিজের হাতেই করে। আজ বিকেলের জলখাবারের মেনু হল ডালপুরি আর সঙ্গে ডুমো ডুমো করে কাটা আলু ছেঁচকি। প্রতিমার হাতের এইসব মুখরোচক খাবার বাবুয়ার খুব পছন্দ। তবে আজকাল বিকেলে তো আর বাবুয়া বাড়িতে থাকে না।

প্রতিমার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ছোটবেলায় বাবুয়া খুব ন্যাওটা ছিল তার, মা-র চাকরিতে তীব্র আপত্তি ছিল ছেলের, প্রতিমাকে সেজেগুজে ব্যাগ নিয়ে বেরোতে দেখলেই হল, হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে যেত বাবুয়া।

সেই বাবুয়ার টিকি দেখা যায় না আজকাল, অতসী নামের মেয়েটাই বোধহয় প্রতিমাকে রিপ্লেস করে দিল। অতসী নামের মেয়েটা কেমন কে জানে, একদিন এসেছিল বাবুয়ার সঙ্গে, ঘণ্টা তিনেক ছিল তাদের বাড়িতে। প্রতিমার সঙ্গে গল্প করার ফাঁকে মেয়েটার চোখ ঘুরছিল সংসারের আনাচেকানাচে, যেন বুঝে নিতে চাইছিল অন্দরের তথ্য।

রাতে অবিনাশ বলেছিল, "তোমার ছেলের বিশেষ বান্ধবী সে। বন্ধুত্ব আর বিবাহ এক নয়। চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অতসী দেখে নিতে চেয়েছে আমাদের আর্থিক অবস্থা, পারিবারিক সমীকরণ। ঝানু মেয়ে এই অতসী। এমন মেয়ের সঙ্গে বাবুয়ার পাকাপাকি সম্পর্ক না হওয়াই ভালো।"

প্রতিমার গলা অসহায় শোনায়, "এ আর আগের বাবুয়া নেই, আমার থেকে অতসীই এখন তার বেশি প্রিয়, আমি বারণ করলে বাবুয়া শুনবে কেন ?"

অবিনাশ বলে, "তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমার ধারণা অতসী নিজেই সরে যাবে। ও মেয়ে তিনতলা বাড়ির সিদ্ধার্থর সঙ্গে সম্পর্ক করেছিল, এখন দেখে গিয়েছে সিদ্ধার্থ থাকে একটা ফ্ল্যাটে। সেখানেও মা, বাবা, দাদুর ক্যাচক্যাচি। অতসী এত ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে চাইবে না।"

প্রতিমা আঁকড়ে ধরেছিল অবিনাশের হাত, "এত লেখাপড়া জানা মেয়ের দরকার নেই বাপু। আমাদের বাড়িতে দেখতে সুন্দর, বনেদি ঘর, বিএ-পাস মেয়ে হলেই যথেষ্ট।"

অবিনাশের গলায় দ্বিধা ছিল, "বিএ-পাস মেয়ে মানে সারাজীবনের জন্য বাবুয়ার গলায় ঝুলে যাবে। এই যুগে মেয়েরা তো ছেলেদের সমান উপার্জন করছে। সেক্ষেত্রে সংসারে আর্থিক টানাটানি কম হয়।"

কড়াইয়ে আলুর ছেঁচকি নাড়তে নাড়তে প্রতিমা ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে, আর্থিক টানাটানির কারণেই তো তার চাকরি করা, আর সেজন্যই স্বশুরমশাইও কোনদিন আপত্তি জানায়নি। নাহলে যা অর্থডক্স মানুষ! আর এই টাকাপয়সার জন্যই বড় ভাসুরের সামনে চিরকাল তাদের মাথা নুইয়ে থাকতে হল।

হঠাৎ প্রতিমার পিছনে ঝন করে একটা আওয়াজ হয়। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে, চারুবালার হাত থেকে অত সুন্দর কাঁচের বাটিটা মেঝেতে পড়ে দু-টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়েছে।

খুন্তি নাড়া থামিয়ে প্রতিমা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "সাবধানে কাজ করতে পারিস না চারু! ইস, অত সুন্দর ডিনার সেটের একটা বাটি ভেঙে দিলি!"

অত জোর আওয়াজ শুনে শাশ্বতীও এসে গেছে রান্নাঘরের দরজার সামনে, ভাঙা বাটিটার দিকে তাকিয়ে সে খরখরিয়ে ওঠে, "ইস, জেম্মার আনা ডিনার সেটের বাটি! কী সুন্দর রঙ ছিল। পড়ে গেল চারুমাসি?"

প্রাথমিক হকচকানি ভাব কেটে যেতে ভাঙা বাটির টুকরোগুলো মেঝে থেকে উঠিয়ে নেয় চারুবালা, বলে, "এ বাড়ির সব ভালো জিনিসই তো বড়বৌদির দেওয়া, আর একটা এনে দিতে বল।"

মেজ কর্তার মাইনে করা কাজের লোক চারুবালার মুখে বড়জার প্রশংসা শুনে প্রতিমার গা জ্বলে যায়, তবে তার মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। সে শুধু কড়া গলায় হুকুম দেয়, "জলখাবার রেডি, টেবিলে প্লেট সাজিয়ে দাও চারু।"

রাতের খাওয়া অবধি আর তর সইছিল না শাশ্বতীর। সে তক্কে তক্কে ছিল। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা থেকে প্রতিমা আর অবিনাশ টিভি সিরিয়ালে মজে যায়, সেই সুযোগে হিরোবাবুর চিঠিটা নিয়ে সে টুক করে ঢুকে পড়লো প্রনবেশের ঘরে। প্রনবেশ এখন চোখ বুজে "খণ্ডন ভব বন্দন তব" মৃদু স্বরে গাইছেন, তিনি শাশ্বতীকে খেয়ালও করলেন না। শাশ্বতী নিঃশব্দে ঢুকে গেল প্রনবেশের ঘরের লাগোয়া বাথরুমে।

চিঠিটা খুলে শাশ্বতী নাক সিটকালো, ইস, কী বিচ্ছিরি হাতের লেখা! লাইনগুলোও সোজা নয়। সিদ্ধার্থর হাতের লেখা ছবির মত সুন্দর। শাশ্বতীর কেমন ধারণা ছিল, পুরুষ মাত্রই ব্রাইট স্টুডেন্ট, মন দিয়ে লেখাপড়া করে, এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি বা নিদেনপক্ষে অবিনাশের মত পলিটেকনিক পাস হয়ই হয়।

আসলে ছোট থেকে মামা, মাসি, কাকা, পিসী প্রত্যেকের বাড়িতেই সে দেখেছে পুত্র সন্তানের এডুকেশনের প্রতি বেশি বেশি নজর। তুলনায় কন্যা সন্তানদের স্কুল-কলেজে যাওয়া যেন টাইম-পাস, বিয়ের বাজারে মূল্য বাড়ানো শুধু। নাহলে বিয়ের পরে সব মেয়েকেই তো শাড়ি আর গয়নার বিজ্ঞাপন হতে হয়, রান্নাঘর অবধি যাতায়াতের ছাড়পত্র মেলে।

শাশ্বতীদের আত্মীয় মহলে প্রতিমাই ব্যতিক্রম, তবে সেও তো সেলাইয়ের দিদিমণি। আর শাশ্বতী সবই জানে, বাবার আয় কম বলেই মা-কে চাকরি করতে হয়।

বাজে হাতের লেখার জন্য হিরোবাবুর চিঠিটা শাশ্বতীকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পড়তে হল। তবে চিঠিটা পড়ে তার মন একদম ফুরফুরে হয়ে গিয়েছে। হিরো লিখেছে, শাশ্বতীর ফিগার নাকি রেখার চাইতেও সুন্দর।

পড়ার টেবিলের নীচের ড্রয়ারের একেবারে কোনে চিঠিটা গুঁজে রাখলো শাশ্বতী। দাদাকেই তার ভয়, নিজে অতসীদির সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে, কিন্তু বোনের বেলাতে যত আটিসুটি।

দাদার হাতে এই চিঠি পড়লে বাবাকে লাগাবেই, আর বাবা তখন শাশ্বতীর পিছনে বসিয়ে দেবে চব্বিশ ঘণ্টার পাহারাদার।

ব্যাস, হিরোবাবু গন !

(চলবে)

স্বপ্না মিত্র একজন প্রবাসী বাঙালি। বিজ্ঞানের ছাত্রী। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে রেডিও-ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স নিয়ে বি-টেক করে বেশ কিছুদিন দেশি এবং বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন। চিরদিনই হার্ডকোর হবি ছিল রিডিং, লেখালেখি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত ভালোবাসার জায়গা। ইদানীং বেশ কিছু লেখা আত্মপ্রকাশ করেছে প্রিন্টেড ম্যাগাজিনে (দেশ, সানন্দা, সাপ্তাহিক বর্তমান, বর্তমান, আনন্দমেলা, বাংলা ফেমিনা, আনন্দবাজার, আজকাল), বিভিন্ন ওয়েব ম্যাগাজিনে এবং বই হিসেবে।

স্বর্ভানু সান্যাল

হাওয়ায় থাকুক হাওয়াই রেশ

বাড়ি থেকে যখন চোখ ভর্তি ঘুম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। আজ থেকে একশ বছর আগে এই সময় নিশ্চয় শেয়াল ডাকত। কিন্তু এখন তারা আর রা কারে না। আমাদের বিমান আসলে ডানা মেলবে ভোর পাঁচটায়। তার অন্তত দু'ঘন্টা আগে চেক ইন করতে হবে। তাই জমজমে ঠান্ডায় ভারি জ্যাকেট, টুপি, দস্তানা পড়ে বাড়ি থেকে বেরুলাম যখন ঘড়ি বলছে রাত্রি আড়াইটে। অবিশ্যি বিমানবন্দরে পৌঁছেই এইসব গরম জামা রূপী আপদকে সানন্দে বাক্সবন্দি করা যাবে। এবারের গন্তব্য হাওয়াই। সেখানে চির বসন্ত।

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। ছোট্ট পুঁতির মালার মত অনেক কটা দ্বীপ অথৈ বারিধি থেকে মাথা তুলেছে মহৎ এবং মহান নভোনীলকে চোখ চেয়ে দেখবে বলে। এবারের যাত্রায় আমরা কভার করব মাউই আর কাউই। নাম শুনে মনে হয় না ঠিক যেন দুই বোন? ওদের বেলাভূমি সতত উর্মিচঞ্চল, ওদের ঘন সবুজাভ বন-বসনাঞ্চল বছরব্যাপী বর্ষণে সুসিক্ত আর্দ্র আর আন্তরিক। ওদের উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গগুলো দীর্ঘ তপসপূতঃ কৃশাঙ্গী যোগিনীর মতই একাকী, উদাসীন এবং কোন অরূপের ধ্যানে যেন চির নিমগ্ন।

এ তো হল কাব্যির ভাষায়। ভূবিদ্যা অর্থাৎ geology কি বলছে একটু দেখে নেওয়া যাক। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রতিটা দ্বীপ-ই আসলে লাভা সঞ্জাত। আমাদের পৃথিবীর উপরের ভূভাগ কয়েকটা টেকটনিক প্লেট দিয়ে তৈরী। আর তার নিচে আছে উত্তপ্ত সান্দ্র তরল ম্যাগমা। এই জায়গাটিকে বলে ম্যান্টল। ঠিক যেমন আমাদের আপাত প্রশান্ত মুখাবয়বের নিচে থাকে একটা ক্রোধে আরক্ত মুখ। এই টেকটনিক প্লেটগুলো আবার বছরে এক সেন্টিমিটার করে উত্তর পশ্চিমে জাপানের দিকে সরে যাচ্ছে। ধরুন যতটা আপনার আঙুলের নখ বারে এক বছরে, গতিটা অনেকটা সেরকম। এখন এই টেকটনিক প্লেট-এ যদি কোনো দুর্বল অংশ বা crack থাকে, সেখান দিয়ে নিচের গরম লাভা উদ্গীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসে সমুদ্রতলে। আর সেই লাভা কঠিন হয়ে নতুন ভূভাগ তৈরী হয়, নতুন দ্বীপ। এই ম্যাগমা উৎক্ষেপণের জায়গাটিকে বলে হট স্পট। প্রক্রিয়াটির নাম হটস্পট ভল্ক্যানিক অ্যাক্টিভিটি। টেকটনিক প্লেট হটস্পটের ওপর দিয়ে ক্রমাগত সরে যেতে থাকে আর অবশেষে ক্র্যাকটি হটস্পট-এর আওতার বাইরে চলে যায়। তখন নতুন লাভা আর বেরুতে পারে না। দ্বীপ নির্মাণ-ও সম্পূর্ণ হয়। আবার অন্য কোনো ক্র্যাক থেকে লাভা বেরিয়ে অন্য দ্বীপ তৈরী হয়। থিয়োরিটির প্রমাণ স্বরূপ দেখবেন, আপনি যদি হাওয়াই দ্বীপ পুঞ্জের সব কটি দ্বীপকে জুড়ে একটি রেখা টানেন, তা নিশ্চিতভাবে জাপানের দিকে নির্দেশ করবে।

উড়ান দশ ঘন্টার। মাঝখানে এক ঘন্টার অবসর এবং বিমান পরিবর্তন ওকল্যান্ডে। আমাদের প্রথম গন্তব্য কাউই। ধারণা ছিল ভোরের ফ্লাইট, মেয়েরা ঘুমোবে প্লেনে। কিন্তু সকলের সন্তান ভাগ্য কি সমান ? আমার সন্তানেরা সারা প্লেন জুড়ে এমন সম্যক তান করল যে কি আর বলব ? ঘুমনো তো দূরের কথা, যে পরিমাণ বাঁদরামিটা করল, তাতে বিশ্ব বাঁদরসমিতির থেকে একটা করে সম্মানসূচক লেজের প্রতিকৃতি ওরা পেতেই পারে। আর এ ছাড়া কারণে অকারণে ওরা দুই বোন, সানাই তাথৈ, যে পরিমাণ ঝগড়া করল তাতে মনে হল সাপে নেউলের শত্রুতাকেও এর তুলনায় বন্ধুত্বের উপাধি দেওয়াই যায়। মানে শুধু এটুকুই বলা যায়, বাকি প্লেনটা যদি শান্ত সমাহিত প্রশান্ত মহাসাগর হয়, তবে আমাদের আইএলটা হল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পূর্বাশা দ্বীপপুঞ্জ, কেপ অফ হোপ। যদিও হোপ আমার এতটুকু ছিল না। কোপবশতঃ বাকি সহযাত্রীরা যদি তাদের সুখনিদ্রার এমন সহায়স্বরূপ আমার কন্যাদ্বয়কে মনে মনে বাপবাপান্ত করে তবে তাদের নেহাত দোষ দিতে পারব না। বিমান থেকে নামবার সময় অপরাধী মুখ করে মাটিতে চোখ রেখে নামতে নামতে চোখে পড়ে গেল এক খরুশ মহিলা

সানাই তাথৈ-এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কি যেন বলছে। খুব যে সুখ্যাতি করছেন না, তা না শুনে বুঝতে অসুবিধে হল না। মাঝে খানিকক্ষণ সানাই অবিশ্যি নিজের ডায়রীতে হাওয়াই ট্যুর নিয়ে লিখতে শুরু করেছিল। আমি ওকে বলেছি সব লিখে রাখতে নয়তো ওর সদ্য-প্রভাত মাথা দেখি কিছুদিন পরেই সব ভুলে মেরে দেয়। যাকে বলে গজনী সিন্ড্রোম। সে যাক। তখন আমাদের নিচে যতদুর চোখ যায় শুধু সাদা তুলো। বিমানে চড়েছি অগুনতি বার। তবু যতবারই দেখি ততবারই মুগ্ধ হয়ে যাই। যেন কোন এক বিরাট শিশু আপন খেয়ালে অনেক বালিশ ফাঁসিয়ে দিয়েছে। আর যত্রতত্র সেই তুলো ফেলে রেখে দিয়ে অন্য খেলায় মেতেছে। সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে মানুষের আকাশ ছোঁয়ার উচ্চাশা রাইট ভাতৃদ্বয় মিটিয়েছে। তাই তো এই অপার্থিব সৌন্দর্য আমাদের নসীব হচ্ছে। সানাই-এর ডাইরীতেই দু লাইন লিখে রাখলাম।

মেঘের দেশ?
বেশ বেশ
হাওয়ায় থাকুক
হাওয়াই রেশ

পরের বিমানে আমাদের সহযাত্রী সহৃদয় আমেরিকান মহিলার কথা না লিখে রাখলে অকৃতজ্ঞতা হবে। তিনি তাথৈ-এর নিখাদ এবং যতিহীন দুষ্টুমি হাসি মুখে সহ্য করলেন এবং অনবরত ওকে এনগেজ করে রাখলেন। নিজের বহুমূল্য অ্যাপল ওয়াচটি দিয়ে দিলেন তাথৈকে গেম খেলতে। নিজের ভ্যানিটি বাগ ঘাঁটার অনুমতি দিলেন। এবং শেষমেশ একটি ছোট টর্চ উপহার স্বরূপ দিয়েই দিলেন নামবার সময়। উনি নার্স, স্বামী ডাক্তার। বয়স ষাটের কাছাকাছি। দুইজনে মিলে চলেছেন কাউইতে সপ্তাহকাল বিনোদযাপনে। এরকম সহৃদয়তা আজকাল আমাদের দেশে কেমন জানি দুর্লভ হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

কাউই বিমানবন্দরে নামলেই প্রথম যেটা দেখতে পাবেন সেটা হল মুর্গি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন এবং আমি আপনাদের একদমই মুর্গি করছি না। মুর্গিরা এখানে পরব্রহ্মের মতই সর্বব্যাপ্ত এবং সর্বত্রগামী। সুখবর এই যে মদগর্বী সভ্যতা এখানে তাদের বিমানবন্দর থেকে নির্বাসন দেয় নি। বিমান বন্দরে মুর্গি ব্যাপারটা বেশ যাকে বলে refreshing। এই তিন আঙুল বিশিষ্ট পক্ষীগুলি ঘন ঘন কণ্ঠসঞ্চালনে দেখে নিচ্ছে আজ প্রভাতের অভ্যাগতদের বেশভূষা, রকমসক, চলনবলন। মানে বলা যেতে পারে chickens are checking out। মোরগ তার রাজকীয় ঝুঁটি এবং ততোধিক জাঁকের পুচ্ছ নাচিয়ে দর্প ভরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পশু সমাজের নিয়ম মেনেই পুরুষ কুক্কুট অনেক বেশি আত্মসচেতন অর্থাৎ কিনা নিজের রূপমুগ্ধ। সমীকরণে মানুষ প্রজাতি আসার পরে অবিশ্যি মানবীরা এই সমীকরণ পুরোপুরি ব্যালান্স করে দিয়েছে সাজাগোজার দায়িত্ব নিজেদের চওড়া কাঁধে নিয়ে। মহিলা পাঠক এই পর্যন্ত পড়ে আমায় মেল সভিনিজম নিয়ে একটু গালাগালি করে নিন কিন্তু সঙ্গে থাকুন। হাওয়াই আপনাকে নিরাশ করবে না।

আমাদের বীচ সাইড রিসর্ট-এর প্রবেশ পথে রাস্তার দুধার দিয়ে বিশাল বটবৃক্ষের হরিৎ পল্লবেরা এমন ঘন চন্দ্রাতপ রচনা করেছে যেখানে সূর্যালোকের প্রবেশাধিকার নেই। দশ ঘন্টার বিমান আর আগু পিছু মিলিয়ে প্রায় ষোল ঘন্টার জার্নি করে শরীর চাইছিল বিছানা। তার ওপরে সময় ওখানে শিকাগো থেকে চার ঘন্টা পিছিয়ে। অর্থাৎ ওখানে যখন নেহাত সন্ধে আটটা শিকাগোয় তখন রাত বারোটা। সুইমিং পুল। বীচ সাইড কাবানা। পার্ক। শপিং সেন্টার। রিসর্টটাকে ভাল করে ঘুরে ঘুরে দেখে টেখে নিয়ে নিদ্রা দেওয়া গেল সে রাত্রির মত।

পরের দিন সকালে আমাদের প্রথম গন্তব্য একটা হেলিকপ্টার ট্যুর। জীবনে প্রথমবার চড়ব। ওই যন্ত্রপক্ষীর পক্ষতারণার জান্তব গর্জনে কানে তালা লাগার জোগাড়। কিন্তু শুরুতেই বিধি বাম। তাথৈ হঠাৎ-ই বেঁকে বসল লাইফ ভেস্ট পড়বে না। বয়স চার হলে সে কিনা ফ্যাশন সচেতন। তার সুন্দর জামার ওপর ওই রংচটা লাইফ ভেস্ট? নৈব নৈব চ! আমরা প্রমাদ গুনলাম। এমন প্রবল কান্না কাঁদল যে মনে হল ওকে কেউ হেলিকপ্টারের আওয়াজের থেকেও উঁচু গলায় আওয়াজ

করার সুমহান দায়িত্ব অর্পণ করেছে। পরিস্থিতি এমন বিগড়ে গেল যে ওকে নিয়ে একজন কপ্টারে ওঠা থেকে বিরত থাকবে কিনা সে ভাবনাও ভাবতে হল। তাতে অনেকগুলো টাকা জলে যাবে যদিও। শেষমেশ কাঁদত তাথৈকে নিয়েই ওঠা হল। সানাই শক্ত করে আমার আঙুল চেপে বলল, বাবা নার্ভাস। আমাদের নার্ভাস সিস্টেম অবশ্য স্বস্তি পেল বোসের noise cancelling headphone কানে দিয়ে। তাথৈয়ের চিৎকার থেকে মুক্তি। তাথৈ অবশ্য দুএক মিনিটে চুপ করে গিয়ে ঘণ্টা খানেকের জন্য আকাশবক্ষে সুখনিদ্রা দিল। পরের দিন ওর দিম্মাকে ফোনে আপডেটও দিল, "আমি হেলিকপ্টারে চড়লাম। তারপর আমি কাঁদু করলাম। তারপর আমি ঘুনু করলাম।" যেন শ্রী রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গ করার মত একটা মাইলস্টোন কাজ করে ফেলেছে।

আকাশপথে কাউই-এর ঘন সবুজ শরীর এককথায় যাকে বলে শ্বাসরুদ্ধকর বা breathtaking। অতিবৃদ্ধের শীর্ণ শিরার মত কোথাও দাঁড়িয়ে আছে শৈলশ্রেণি, কোথাও গভীর পুরোনো ক্ষতের মত উপত্যকা, কোথাও বা পাহাড়ের ধূসর শরীর কেটে নেমে যাচ্ছে রুপোলি নদীর রেখা, ভূগোলে এদেরই নাম গিরিখাত, কোথাও বা সমুদ্রের বিলোল শরীর থেকে সোজা উঠে গেছে শৈলশিরা। অজস্র তরঙ্গিত ঊর্মিমালা নিয়ত সেই শৈলগাত্রে এসে দীর্ঘ বিরহী প্রিয়ার মত সজোড়ে আছড়ে পড়ছে এবং শতধায় চুর্ণ বিচূর্ণ হয়ে কাঁচের গুঁড়োর মত ছড়িয়ে পড়ছে। আহা কি শোভা। জানা গেল কোস্ট লাইনটার নাম নাপালি কোস্ট। কোথাও আবার পাহাড়ের বুক থেকে নেমে আসছে পাহাড়ি ঝর্ণা। সবচেয়ে বিখ্যাত ফলস টির নাম আপাতত জুরাসিক ফলস। জুরাসিক পার্ক ১ ছবিতে এই ফলসটিই দেখেছি আমরা। জানা গেল পুরো ছবিটিই নির্মিত এই ট্রপিকাল রেইন ফরেস্ট-এ। সবচেয়ে শ্বাসরুদ্ধকর জায়াগা ছিল ওয়ালেওয়ালে ভ্যালী। সারা বছর একশ সেমির বেশি বৃস্টি হওয়ায় সবুজের উৎসব লেগে গেছে সেই উপত্যকায়। আর এই রূপের মাঝেই অরূপকে খুঁজে পেত প্রাচীন হাওয়াইয়ানরা। স্থানীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ীই এখানে দেবতারা এসে মিলিত হয়। চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই গোপন উপত্যকায় যেন দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্নর তার একান্ত প্রণয়ী এক কিন্নরীর নগ্ন শরীর পরম আহ্লাদে মিলিত হচ্ছে, দুটো মন, দুটো আত্মা মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে, আমাদের প্রথম অদ্বৈত অনুভূতি তো শরীরী মিলনেই, আর এখানে তাদের সেই মিলনদৃশ্যের গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে প্রকৃতি স্বয়ং।

এছাড়া দেখলাম ওয়াইমিয়া ক্যানিয়ন। হাওয়াইয়ান পুরাণে একটি প্রেমগাথা আছে এই উপত্যকা নিয়ে। হাইকু নামক এক উপদেবতা পৃথিবীতে এসে রাজকন্যা কায়েলুর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। বিয়েটিয়ে করে ঘরকন্না করতে গিয়ে যা হয় আর কি! ঝগড়া। হাইকু ক্রোধে অন্ধ হয়ে কায়েলুকে পরিত্যাগ করে ফিরে যায় তার স্বর্গভূমিতে। বিরহিনী বেছে নেয় আত্মহনন। স্ত্রী মৃতা শুনে মনস্তাপে হাইকুর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। ফিরে এসে সে যাবে ঠিক করে পো, ল্যান্ড অফ ডেড-এ। তার একান্ত কায়েলুকে ফিরিয়ে আনতে হবে। একটি শক্তপোক্ত লতা দিয়ে বিরাট এক দড়ি তৈরী করে সে নামে এই ওয়াইমিয়া ক্যানিয়নে। সেখানে ভীড় করে সমস্ত সদ্যমৃত আত্মা। ওই মৃতদের ভিড়ে খুঁজতে থাকে হাইকু চেনা মুখটিকে। যেমন করে আমরা করি মৃত সম্পর্কের খোঁজ, ঠিক তেমনটাই। অনেকদিনের প্রচেষ্টায় খুঁজে পায় তার কায়েলুকে। তারপর আর কি ? হাতে পায়ে ধরে কান্না। ফিরে চলো। বিবাহিত পুরুষ মাত্রই জানেন এই মান ভাঙানোর খেলা।

শেষমেশ অভিমানিনীর হৃদয় গলে জল। সে জীবন ফিরে পেতে রাজি। তারপরে আর কি ... living happily ever after। মানে পুরাণ সেই কথা বলে। কিন্তু আমি জানি গোপন কথা! মরণের ওপার থেকে ফিরে এসেই পরের দিন-ই হাইকু আর কায়েলুর মধ্যে নেহাত তুচ্ছ কারণে আবার তুমুল ঝগড়া হয় মানে হতে বাধ্য আর কি! তবে কিনা হাইকু আর ছেড়ে যায় নি বৌকে। কোন এক সাহিত্যিক, বোধ হয় শরৎ চাটুজ্যের লেখায় পড়েছিলাম সাংসারিক সংঘাতে আমাদের অন্তরের ঘটিবাটি প্রতিনিয়ত তুবড়ে যায়। তারপর কোন এক অদৃশ্য কারিগর আমাদের আড়ালেই তাকে ঠুকে ঠুকে আবার ব্যবহারের উপযোগী করে দিয়ে যায়। সব ক্ষতে প্রলেপ লাগে, সব অভিমানে বিস্মৃতির ধুলো। এরই নাম সংসার চক্র, wheel of samsara। এই চক্রে আমরা নিয়ত আবর্তিত হই, পিষ্ট হই, নির্যাতিত হই, নিঃশেষিত হই অথচ পরমুহূর্তেই জেগে ওঠে আশা কোনো অনাগত আলোমাখা দিনের। আর সেই মরীচিকা চয়নেই আমাদের সততঃ সন্ধান।

দর্শন থাক, হাওয়াই-এর আর একটি উপকথায় আশা যাক। এই বিরহের কাহিনীটি শুনে আমার বাঙালি হৃদয় মনে করিয়ে দিয়েছিল রুপাই আর সাজুর কথা। সুন্দরী রাজকন্যা নাউপাকা। তার কেশ মেঘবরণ, হরিণীর ন্যায় চপল চরণ। তার চোখে ভ্রমর। তার ক্ষীণ কোমর। একদিন যখন নাউপাকার কোমল চরণ সমুদ্রের ঢেউ এসে ধুইয়ে দিচ্ছিল, দেখা হয়ে গেল কাউই-এর সাথে, এক সুদর্শন যুবক, জাতে ধীবর অর্থাৎ কিনা জেলে বা মৎস্যজীবী। ব্যাস চোখে লাগলো ঘোর, মন বিভোর। দীঘি আঁখি নামিয়ে ছুটে চলে গেল সে। কিন্তু যে রং লেগেছে মনে, তাকে যে মোছা যায় না। অথচ কেই বা না জানে রাজকন্যার সাথে এক সাধারণ জেলের মিলনের পথে অন্তরায় তাদের বিস্তর আর্থিক ও সামাজিক প্রভেদ। নাউপাকা কাউইকে বিয়ে করার জন্য হাতে হাত ধরে ঘর ছাড়ল। তারপর দীর্ঘদিন দুজনে কত গিরিমালা, কত অরণ্য, কত নির্জন উপত্যকা, কত উপল ব্যথিত নির্ঝরিণী পেরিয়ে চলল কাহুনা বা প্রধান পুরোহিতের সন্ধানে। কতবার জড়াল হাইকুর কেঠো আঙুলে নাউপাকার কোমল অঙ্গুলি। কতবার চোখে চোখে বিদ্যুৎ রেখা খেলা করে গেল। কতবার হৃদয় মেলে ধরল প্রণয় ব্যথিত দুটি প্রাণ। অবশেষে দূরদেশে প্রধান পুরোহিতের সাথে দেখা করে দুই বালক বালিকা বলল তাদের মর্মব্যথা। পুরোহিত বললেন, এ বিয়ে তো হবার নয়, তবু তোমরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করো। যদি এই বিয়ে দেবতাদের প্রার্থিত না হয়, ওনারা সংকেত দেবেন। প্রার্থনা শুরু করা মাত্র বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হল। দেবতাদের কাঙ্খিত নয় এ বিয়ে। নাউপাকা বিদারী ব্যথায় নিজের মাথার ফুলটি ছিঁড়ে দু ভাগ করে এক ভাগ দিল তার প্রেমিককে। ঐ স্মৃতিটুকু সম্বল করে ধীবর ফিরে গেল দেশে। বিরহিনী নাউপাকা দুঃখে প্রাণ বিসর্জন করল। সেই থেকে নাউপাকা ফুল হয়ে ফোটে যা দেখলে মনে হয় আধখানা ফুল, যেন কেউ একখানা ফুলকে চিরে দুভাগ করে দিয়েছে।

হেলিকপ্টার থেকে নামলাম যখন তখন খালি মনে হচ্ছিল, যা দেখলাম সে যেন বড় পবিত্র, যেন এ আমাদের দেখার কথা ছিল না। এই অপ্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষের চর্মচক্ষুতে ধরা দেবার জন্য নয়। নৈয়ায়িক কি বৈশেষিক হয়তো এই সময় প্রশ্ন তুলবেন চেতনসত্তা না থাকলে কি সুন্দর থাকত? দৃশ্যের কি দ্রষ্টা ব্যাতিরেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে? এই সব epistemological প্রশ্ন কে অনুত্তর রেখে চলুন যাই আমাদের পরবর্তী গন্তব্যে। কাউই-এর হিন্দু মন্দির। monastry বলা ভাল। শিব মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা দক্ষিণ ভারতীয় শৈব গুরু সুব্রমুনিয়া স্বামী। ঘন তরু পল্লবিত শান্ত সমাহিত এই আশ্রমটিতে দেবাদিদেব মহাদেব ধ্যানমগ্ন। সেই নিমীলিত চক্ষু বলছে ধ্যেয় ও ধ্যাতা মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন। আমেরিকান হিন্দু সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী দ্বারাই আশ্রমটি প্রধানত পরিচালিত। মূল মন্দির প্রাঙ্গণে দুজন আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ গভীর ধ্যানে জড়জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে অবস্থান করছেন। মন্দির পার্শবর্তী উদ্যান, দীর্ঘিকা, গিফট শপ, পাঠাগার দেখতে দেখতে অনেকটা সময় কেটে গেল। রুদ্রাক্ষ গাছের বাগানটিও দর্শনীয়।

বেরিয়ে আমরা কাউই দ্বীপের উত্তর ও পূর্ববর্তী দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখব বলে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরলাম। কিন্তু ততক্ষণে বেলা গড়িয়ে দ্বিপ্রহর। জঠর দেবতা জানান দিচ্ছে তার পূজার সময় হয়েছে। একটি ম্যাকডোনাল্ড দেখে দাঁড়িয়েই দেখি পাশেই শোভা পাচ্ছে ভারতীয় রেস্তোরা শিবালিক। আরে গুলি মারো ম্যাকডিকে। ভারতীয় খানা পেলে শুকনো বার্গার চেবায় কোন উজবুক? তৎক্ষণাৎ গাড়ি ঘুরিয়ে শিবালিকের সামনে পার্ক করা গেল। দোকানের মালকিন গুজরাতি। নিজেই ঘুরে ঘুরে অতিথিদের আপ্যায়ন করছেন। কাউই'তে তার স্বামী একটি ভেকেশান হোম কিনেছিলেন। তারপর গোটা কাউইতে একটাও ইন্ডিয়ান রেস্তোরা নেই দেখে শিবালিক খুলেছেন তা প্রায় তের বছর হয়ে গেল। পেটের আগুন নিভিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। এইবার আমরা একে একে পৌছে যাব ওপায়েকা ফলস, কাপা শহরতলি, কিয়ালিয়া বীচ, কিলাউয়া লাইট হাউস হয়ে অবশেষে ছোট্ট বীচটাউন হানালেই। হানালেইতে আমরা অনেকটা সময় কাটালাম। ম্যান্ডেটরী শপিং, চিংড়ি মাছের একটি প্রিপারেশান উপভোগ করা গেল। সাথে ছোটদের শেভ আইস। অদ্ভুত সুন্দর শহর। নৈসর্গিক শোভা। সর্বত্র ফুটে আছে হলুদ জবা। ও হ্যাঁ মুর্গি ছাড়া আর যেটি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে সর্বত্র দৃশ্যমান তা হল নানান রঙের জবা। সাদা, গোলাপি, হলুদ, লাল, আরও কত রঙ। হাওয়াই-এর জাতীয় ফুল এই জবা। ধীরে ধীরে সূর্য নরম হয়ে গলে পড়ল পশ্চিম কোণে। ধীরে নেমে এল সন্ধ্যা এবং আমরাও ফিরতি পথ ধরলেম সেদিনের মত।

পরের দিনের গন্তব্য দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে। প্রথমেই গিয়ে থামলাম ওয়াইলুয়া ফলস-এ। পাহাড়ের গা থেকে শতধারায় নেমে আসছে ওয়াইলুয়া ফলস। এক সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ সেইখানে বসে বিভোর চোখে রঙ ও তুলিতে ধরে চলেছেন অপরূপ শোভাময়ী প্রকৃতিকে। এই ছবি বিক্রি করেই সংসার চলে তবে বিক্রি করার কোনো তাড়া নেই। পাশে রাখা আছে আগে শেষ করা ছবিগুলি। কেউ চাইলে দেখতে পারে কিন্তু কেনবার জন্য কোনো পীড়াপীড়ি নেই। তিনি নিজ শিল্পকর্মে মগ্ন। ভাবলাম বৃদ্ধকে সাহায্য করার জন্য একখানি কিনি কিন্তু তিনি আধুনিক অর্থ বিনিময়ের কোনো উপায়ই জানেন না, শুধুমাত্র নগদ টাকাই নেবেন। অনলাইন ট্রান্সফার করতে করতে ক্যাশ রাখার অভ্যেস গেছে তাই কিনতে পারলাম না। তবে বৃদ্ধ মন কেড়ে নিলেন যখন তাঁর আঁকা একটি সমাহিত বুদ্ধমূর্তির দাম জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, ওটি উনি বিক্রি করবেন না। এঁকেছেন ওনার স্ত্রীকে উপহার দেবেন বলে। স্ত্রী খ্রিস্টান হয়েও বুদ্ধানুরাগী। স্ত্রী এখন অন্য শহরে। ক্রিস্টমাসের সময় দেখা হলে তিনি ছবিটি উপহার দেবেন। এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতি, এই সব পরমাশ্চর্য প্রেম, এইসব মিলন বিরহ কথাই তো আদিকাল থেকে সাহিত্যের উপজীব্য। এর বিহনে জীবন তো ঊষর মরুভূমি হয়ে যেতো।

বৃদ্ধের কথা ভাবতে ভাবতেই চললাম পরবর্তী গন্তব্য পইপু বীচ এবং তৎসংলগ্ন spouting horn blowhole দেখতে। এখানে সমুদ্র বিক্ষুব্ধ। এতো জোড়ে হাওয়া চলছে যে ছোট্ট তাথৈকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জোগাড়। আর তার সাথে দৈত্যাকৃতি ঢেউ। আর ঠিক এই কারণেই কিছু অকুতোভয় অ্যাডভেন্চার প্রিয় যুবক যুবতীর প্রিয় জায়গা এটি। এরা সার্ফার। সেই ঢেউয়ের ওপর দিয়ে কি অমিত কৌশলে সার্ফিং করছে সে একটা দেখার মতই ব্যাপার। আর দেখলাম ব্লোহোল। ঢেউগুলো সবেগে ঢুকে যাচ্ছে পাথরের নিচে আর ওপরের একটা ফুট দিয়ে তীব্রবেগে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে ফোয়ারার মত। এটাকেই blowhole বলে। খানিক সময় কাটিয়ে এগিয়ে পড়লাম। কারণে অকারণে দাঁড়ালাম বিভিন্ন জায়গায়। সুপার মার্কেটের করাল গ্রাস থেকে বেঁচে এখানে এখন কিছু চাষি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আনারস, পেপে ইত্যাদি বিক্রি করে। হাওয়াই-এর প্রধান রপ্তানি হল এই আনারস। যেমন স্বাদ তেমন গন্ধ। এক চাষির কাছ থেকে আনারস কিনে খাওয়া গেল। আর গুড়ের মত মিষ্টি পেঁপে। গ্রাম্য চাষি ইংরেজি জানে না। বহু কষ্টে দামটা বুঝে নিয়ে পেমেন্ট করা গেল। যেখানে তার অস্থাবর দোকান, পাশেই বিশাল কলাবাগান। সেখানে কাঁদি কাঁদি কলা ধরে আছে। মোচা, সানাই-এর ভাষায় যা কিনা বেবি কলা, তা কেমন করে কলায় রূপান্তর হয় দেখে সানাই-এর চক্ষু চড়কগাছ। এমন অদ্ভুত ঘটনা তার ছোট্ট জীবনে দেখে নি সে। হানাপেপে শহরে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে অবশেষে যখন ওয়াইমিয়া ক্যানিয়নের পাদদেশে পৌঁছলাম তখন বিকেল। একেই গতকাল দেখেছিলাম আকাশবক্ষ থেকে। নিচের মহিলা বলেই দিলেন ভাল ভিউ পাওয়া যাবে না। প্রতি সন্ধেতেই এই ট্রপিকাল রেইন ফরেস্ট-এ বৃস্টি হয়। মেঘ জমতে শুরু করে বিকেল থেকেই। তাই দেখা যাবে না কিছুই। তবু ওপরে গেলাম চোখ কানের সন্দেহভঞ্জনে। ওয়াইমিয়া ক্যানিয়ন দেখে ফিরতি পথ ধরলাম। ও হ্যাঁ শিবালিক থেকে রাতের বিরিয়ানিটা অর্ডার করে দিতে ভুললাম না।

পরের দিন ভোরবেলা প্লেন ধরে কাউই থেকে হনুলুলু হয়ে মাউই। মাউইতে প্রথম রাত আমরা কাটাবো হানাতে। এই হানা যাওয়ার যে রাস্তা সেটি বিশ্ব বিখ্যাত রোড টু হানা বলে পরিচিত। বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর সিনিক ড্রাইভ-এর মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে একটি। এয়ারবিএনবি থেকে বাড়ি বুক করা আছে কিন্তু জানি যে হানা ভীষণ প্রত্যন্ত অঞ্চল। পাঁচটার মধ্যেই দোকানপাট বন্ধ করে ঘুমের দেশে চলে যায় হানা। অতএব দু রাত্রির মতন আলু, ডিম ইত্যাদি সংগ্রহ করে হানার উদ্দেশে গাড়ি ছোটালাম। মাউইতে আমাদের সঙ্গী একটা জীপ যার হুড বা ছাদ খোলা যায়। মনে মনে ছড়া কাটলাম।

আজকে নগর ফিরেই যা না
মানছে না মন কোনোই মানা
মেলছে পাখা ইচ্ছে ডানা
ছুটছে গাড়ি ... রোড টু হানা

হালিয়াকালা আগ্নেয়গিরি যাওয়ার রাস্তা ছাড়তেই সুন্দরী হানা ধীরে ধীরে আপন রূপের ডালি নিয়ে ছেঁকে ধরলো। সে ঠিক কেমন সুন্দর তা ঠিক শব্দে বর্ণনা করা যায় না। মৌসিনরাম-এর পরেই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বৃষ্টিপাত অঞ্চল এই

হানা। অকৃপণ বারিধারায় সঞ্জীবিত হয়ে প্রাণের যেন মেলা লেগে গেছে। রতিদেব যেন সহস্র হস্তে পুষ্পবাণ বর্ষণ করেছে। চারিদিকে সবুজের কোনো বিরাম নেই। নয়নাভিরাম কি একেই বলে? অজস্র ঝর্ণা ঝুমকো লতার মত নেমে আসছে। পুরো পথে ঊনষাট খানা অপ্রশস্ত সেতু যাতে একসাথে শুধু একটা গাড়ি যেতে পারে। একটা গাড়িকে সেতু পার করতে দেখলে খানিক দূরে থেমে যাওয়াই দস্তুর। ধীরে গাড়ি চালাতে হয় এই হানার পথে। তাতে কিছু না। সময়কে হানা ছুটি দিয়েছে পৃথিবীর ঊষালগ্নেই। সভ্যতার জয়রথ এখানে ভূলুণ্ঠিত, অমোঘ কালের গতি এখানে রুখে দিয়েছে। সানাই বলল, বাবা বলো তো, how can time fly? বললাম, জানি না। সানাই চোখ বড় করে বলল, if u throw an alarm clock across the room, time flies. Get it? তা জোক খানা মন্দ না। ছোটোদের একটা জোকস বুক কিনেছে কদিন হল। সেটি নিয়ে এসেছে ওর আইল্যান্ড ট্রিপে। পড়ছে, হাহা করে হাসছে আর শোনাচ্ছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে মনে মনে পিছিয়ে গেলাম অনেক অনেক বছর, আমার জন্মের দেড় সহস্র বছর আগে।

পলিনেশিয়ান আইল্যান্ড মারকুইসাস থেকে বেরুল অনেক কটা ডিঙি নৌকো। কাঠের ভেলাগুলো অথৈ সমুদ্রে যেন মোচার খোলা। গন্তব্য অনির্দেশ। দ্বীপে খাদ্য সঙ্কুলান হচ্ছে না। খুঁজে পেতে হবে নতুন ডাঙা যেখানে ভূমি উর্বরা। সেইখানে ধরিত্রীর বুক চিরে রোপণ করে দেবে তারা টাড়োর বীজ, মনে স্বপ্ন। শষ্যশ্যামলা হবে ভুমি। সন্তান দু বেলা পেট ভরে খেতে পাবে। চোখে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে ঘর ছাড়ল তারা। জানে, এরা জানে, এরা কেউই আর কোনদিন তাদের পরিচিত ভূমিটিতে ফিরবে না। যে মানুষগুলোকে ফেলে গেল তাদের সাথে আর কোনোদিনও দেখা হবে না। অনেক নৌকো সমুদ্রগর্ভেই সলিলসমাধি নেবে। হয়তো সব কটাই। কিন্তু যদি খুঁজে পায় কোনো উপযুক্ত স্থলভূমি, তবে আবার নতুন করে সংসার হবে, আবার নতুন করে গাঁথা হবে নকশী কাঁথা, স্বপ্নের মায়াজাল। মানুষ যাযাবর।

কালের কবরে শুয়ে জীবনের শর্তটুকু যেন।
মানুষ তো পরিযায়ী, স্বস্থানে ফেরে না কখনো।

প্রশান্ত মহাসাগরে ২৩০০ মাইল নৌকো বেয়ে পৌঁছল হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। পরে ইতিহাস বলবে সন তখন আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দ। প্রায় অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। কয়েকটা প্রাগৈতিহাসিক কাঠের ভেলায় ২৩০০ মাইল সমুদ্র অভিযান। অদ্ভুত সব নাবিক। তখনো মানুষ চিন্তার স্রোতে নিয়ত হারিয়ে যেতো না। তখনও তারা অবাক বিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করত প্রকৃতিকে আর খুঁজে পেত প্যাটার্ন। শুধুমাত্র বর্তমান ঋতু আর নক্ষত্রের অবস্থান অর্থাৎ পৃথিবী থেকে কোনো একটা তারার কৌণিক দূরত্ব দেখে অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ না জেনেও পৃথিবীর বুকে নিজেদের আনুমানিক অবস্থান নির্ধারণ করতে পারত তারা। নির্ধারণ করতে পারত কোন দিকে বাইতে হবে নৌকো। সাথে সমুদ্রের জোয়ার ভাটার প্যাটার্ন পাঠোদ্ধার করেও পাওয়া যেত গতিপথ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ক্লু। পরিযায়ী পাখিদের উড়ান পথও পথ দেখাত। আর সাথে তো আছেই ফ্রিগেট পাখি। ডানা ভিজে যায় বলে এই পাখি জলে নামে না। তাই নৌকো থেকে একে ছেড়ে দিলে ক্লান্তডানা পাখি যদি নৌকোতেই ফিরে আসে তবে বুঝতে হবে আশেপাশে কোনো ডাঙা নেই। কিন্তু পাখি যদি না ফেরে তবে বুঝতে হবে ডাঙা আছে কাছে এবং তখন পাখির উড়ানপথ অনুসরণ করে চললেই পাওয়া যাবে ডাঙা। প্রাক দূরবীন যুগের কথা সেসব। মনুষ্যেতর প্রাণীদের প্রখর ইন্দ্রিয়ের কি উদ্ভাবনী ব্যবহার! অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা, বাধাব্যাত্যয় পেরিয়ে তারা নামলো আজ যেটাকে বিগ আইল্যান্ড বলে তার কা লাই সৈকতে। সেই থেকেই শুরু হাওয়াই দ্বীপে এই দুপেয়ে জীবের কলাকারবার।

গাড়ি চলছে হানার পথে মন্থর গতি। কিছু পরে পরেই দ্রষ্টব্য স্থান। আপনাকে pick and choose করতেই হবে। কারণ সব জায়গায় দাঁড়ালে সন্ধ্যে গড়ানোর আগে আপনার রাত্রি নিবাসে পৌঁছতে পারবেন না কিছুতেই। আমরা প্রথম দাঁড়ালাম টুইন ফলস-এ। সেখানে খানিকটা hiking করে নিচে নেমে গিয়ে ঝর্ণাটা দেখতে হয় যদিও ওপর থেকেও তার চঞ্চল অঝোর বারিধারা মন্দ দেখা যাচ্ছে না। সানাই তাথৈকে নিয়ে নিচে নেমেই দেখলাম ঝর্ণাটিকে। পরের থামার জায়গা কাইনাই আরবোরেটাম। সেখানে যে কতরকমের ট্রপিকাল ফুল ফুটে আছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কত

রূপে কত রঙ্গে সেখানে প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ। একটা জায়গায় আবার হাঁসেদের খাওয়ানো যাচ্ছে, সঙ্গে খেতে চলে আসছে সাদা ময়ূর। অনেকটা সময় কেটে গেল। ছেড়ে যাওয়া যায় না এমন ঐকান্তিক দৃশ্যাবলিকে। ক্ষণে ক্ষণে ছবি তুলতে ইচ্ছে করছে অথচ সে ছবি কিছুতেই যেন ধরতে পারছে না এই অলীক রূপসীটিকে। আবার গাড়িতে যাত্রা শুরু। হুড খুলে দিয়েছি গাড়ির। মৃদুমন্দ ভিজে হাওয়ায় চুল উড়ছে। মন উড়ছে।

আগন্তুকরা গড়ে তুলল এক নবীন হাওয়াইয়ান জীবনধারা। চাষবাস, মাছ ধরা, হাঁস, মুর্গি, গরু পালন, সমুদ্রযাত্রা সব কাজেই তারা পারদর্শী। ধীরে ধীরে বেশ একটা সভ্যতার জন্ম হল। দ্বীপের মাঝে পাহাড়, চারদিকে সমুদ্র। তাই দ্বীপগুলোকে পাই বা পিজা স্লাইসের মত করে ভাগ করা হল। এক একটা ভাগ এক একটা জেলা, হাওয়াইয়ান ভাষায় মোকু। মোকু ভাগ হয় আহুপুয়াতে। আহুপুয়ার প্রধানের নাম কোনোহিকি। মোকুর প্রধানকে বলে আলি ই মোকু। আর সমগ্র দ্বীপের রাজার নাম আলি নুই। দ্বীপকে মোকুতে ভাগ করে দেওয়াতে তাদের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। যেহেতু প্রতিটি মোকু পাহাড় থেকে সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত বিস্তৃত সেহেতু পার্বত্য সম্পদ (resource) এবং সামুদ্রিক সম্পদ দুইই পায় একটা মোকু। মাউকা মানে পাহাড়ের দিক আর মাকাই মানে সমুদ্রের দিক। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তৈরী হল সামাজিক নিয়মকানুন, হাওয়াইয়ান ভাষায় কাপু, যার ইংরেজি তর্জমা হবে ট্যাবু বা নিষিদ্ধ। যেমন রাজা মাথায় পরবে লাল-হলুদ পালক কিন্তু সাধারণে তা পরলে তা হবে কাপু। রাজ বংশজাত কারুর সাথে সাধারণের দেখা হলে চোখ তুলে দেখা হল কাপু। রাজবংশীয়দের চুল, নখ ছোঁয়া সাধারণের পক্ষে হবে কাপু। মেয়েরা ছেলেদের সাথে একসাথে বসে খেতে পারবে না। মেয়েরা কিছু কিছু নিষিদ্ধ খাবার খেতে পারবে না যেমন পর্ক বা শুয়োরের মাংস, কলা, পবিত্র শস্য টাড়ো ইত্যাদি। লিঙ্গ বৈষম্য থাকলেও মোটের ওপর মেয়েরা ছিল স্বাধীন বিশেষত যৌনতার দিক থেকে।

এরপর থামা হল কাইনাই পেনিনসুলাতে। পাহাড়ের গায়ে একটি উদ্যান। কাইনাই আরবোরেটাম যদি রূপসী নারী হয়, এ যেন বলদর্পী দৈত্য। ভিতরে ঢোকা মাত্রই গভীর বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে গেলাম। জুরাসিক পার্ক-এ যেমনটি দেখা যায়, সেইরকম প্রাগৈতিহাসিক বৃক্ষরাজীর দখলে সম্পূর্ণ জায়গাটি। আর স্থানে স্থানে আছে rainbow eucaliptas। তার শরীর জুড়ে এমন অদ্ভুত রঙের খেলা যে নাম হয়েছে রামধনু ইউক্যালিপ্টাস। সব দেখতে দেখতে অবশেষে যখন হানাতে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই। তন্নতন্ন করে খুঁজে একটা কফির দোকান খোলা পাওয়া গেল না। হানা ঘুমিয়ে পড়েছে। অগত্যা আমাদের এয়ারবিএনবিতে গিয়ে বডি ফেলা গেল। আমেরিকায় এই এয়ারবিএনবির ব্যাপারে যারা জানেন তারা জানেন এটি আদতে কারু বাড়ি যা ভ্রমণার্থীদের ভাড়ায় দেওয়া হয়। কিচেনে গিয়ে চালে আলুতে ডিমে ফুটিয়ে নেওয়া গেল। ঘি দিয়ে উফ্ সে যেন অমৃত! ভাগ্যিস এনেছিলাম। নয়তো আজ রাতে নিঃসন্দেহে পেটে ভিজে গামছা দিয়ে শুয়ে পড়তে হত কারণ একটা দোকান খোলা নেই।

নিশুতরাতে হানা এতটাই নীরব, এতটাই স্তব্ধ যে আপনি যদি চান নিজেকে খুঁজে পাবেন। জাগতিক কোলাহলে, জীবনের ক্যালাইডোস্কোপে আমরা নিজেকে হারিয়ে ফেলি প্রত্যহ। এইখানে এসে হয়তো আপনি বসলেন আপনার লানাইতে, হাওয়াইয়ান ভাষায় লানাই অর্থে ব্যালকনি, উল্টোদিকে এসে বসল হয়তো আপনারই প্রতিরূপ, ক্লান্ত, কলুষিত। সেই আপনার চেয়ে আপনের সাথে অজস্র না-বলা কথা বললেন। নীরবে। সে প্রশ্ন করল, কেন কেন কেন? আপনি উত্তরহীন হয়ে বসে রইলেন। অলক্ষে চেয়ে রইলেন মায়া যিনি সকল কেনর কারণস্বরূপা। উত্তর দিতে না পেরেও আপনি কিন্তু নির্ভার হলেন, লঘু হলেন পালকের মত। ইংরেজিতে একেই বলে unwinding। ও হ্যাঁ "সানাই ইন দ্য লানাই" ছবিটা তুলে নিতে ভুললাম না।

শিশু কামেহামেহাকে রাতের অন্ধকারে গাছের বল্কলে জড়িয়ে নিয়ে নিঃসাড়ে দৌড়চ্ছেন তার বাবা কেউয়া। মাঝে মাঝে ফিরে তাকাচ্ছেন স্ত্রী কেকুইয়ের দিকে। দুজনেরই কোমরে ঝুলছে পশুর হাড় নির্মিত ঝক্‌ঝকে ছড়া। আততায়ীর বুকে আমুল বসিয়ে দেবে তারা প্রয়োজন হলে। শিশু কামেহামেহার জীবন প্রাণ থাকতে নিতে দেবে না তার বাবা-মা। এ শিশুর

জীবন যে অমূল্য। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী-এর পেটে মাথা রেখে গভীর স্নেহে প্রশ্ন করেছিলেন কেউয়া। কি খেতে ইচ্ছে করছে? হাঙরের চোখ, উত্তর দিয়েছিল সরলা কেকুয়া। শঙ্কিত কেউয়া চকিতে ছিটকে সরে গেছিল।

"চুপ চুপ। জানো না, অন্তঃসত্তা মা হাঙরের চোখ খেতে চাইলে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় সে রাজহন্তা হয়। আলি নুই খবর পেলে এখুনি তোমায় তুলে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের খাদে ঠেলে ফেলে দেবে।"

কিন্তু খবর গোপন থাকে নি। স্থানীয় আলি নুই-ই মোকু বা জেলা প্রধানের কানে পৌঁছেছিল। তার জীবনাশঙ্কা অতএব শিশুটি ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র হত্যা করতে হবে, জেলা প্রধানের কড়া আদেশ। আর তাই সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে অরণ্যে গিয়ে আত্মগোপন করলেন কেউয়া আর কেকুই। শিশুটিকে দত্তক নেয় তৎকালীন রাজা বা আলি নুই কাহেকেলি। শিশুটি তার ভাগ্নে অর্থাৎ বোনের ছেলে। জন্মের সময় এক আশ্চর্য তারা আকাশ কেটে চলে গেছিল। এ ভীষণই শুভ লক্ষণ। এ শিশু অমর কীর্তি স্থাপন করবে। জন্মের সন ১৭৫৮। হ্যালির ধূমকেতুই সম্ভবত সেই তারা। শিশু কামেহামেহা ছোট থেকেই জানতেন তিনি পূর্বনির্দিষ্ট সমগ্র হাওয়াই দীপপুঞ্জকে এক রাজত্বের আওতায় আনবার জন্য। ছোটোবেলা থেকেই যেন একশ হাতির শক্তি তার শরীরে। আর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি তুলে ফেলে দিলেন নাহা পাথর, আড়াই থেকে তিন টন যার ওজন। ওই পাথর যে তুলতে পারবে সে সমগ্র হাওয়াই-এর সম্রাট হবে, এ কথা কে না জানে? হাওয়াই-এর তৎকালীন আলি নুই ছিল কামেহামেহার কাকা কালানিওপু। কামেহামেহার বীরত্বের খবর ছড়িয়ে পড়ায় কালানিওপুর অভিভাবকত্ব লাভ করলেন তিনি। ষোল বছর বয়সে হলেন যুদ্ধের দেবতা কুকা-র প্রধান পুজারী। খুব শীঘ্রই তিনি বেশ কিছু স্থানীয় প্রধানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেললেন। কালানিওপু মারা গেলে তার ছেলে কিওালাওকে সিংহাসনচ্যুত করে হাওয়াই বা আজকের দিনের বিগ আইল্যান্ড-এর আলি নুই বা রাজা হয়ে বসলেন কামেহামেহা।

কিন্তু অল্পে তুষ্ট নন তিনি। সমগ্র হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজা হবেন তিনি এমনটাই তো পূর্ব নির্দিষ্ট। ক্যাপ্টেন কুক ও পরবর্তী ইউরোপীয়ান ব্যাপারীদের কাছ থেকে কিনে নিলেন কামান, বন্দুক, বারুদ ও বারুদ তৈরীর ফর্মুলা। ইউরোপিয়ান যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী দুজন ইউরোপিয়ান জন ইয়ং আর আইজাক ডেভিসকে রাখলেন প্রধান পরামর্শ দাতা হিসেবে। মাউই আক্রমণ করলেন কামেহামেহা। কেপানিওয়াই-এর যুদ্ধে হেরে প্রাণ দিলেন মাউই-এর তৎকালীন রাজা। ইয়াও নদীর জল রক্তে লাল হয়ে গেল বলে যুদ্ধের নাম হল "রক্তে রাঙ্গা জলের যুদ্ধ" বা "battle of the dammed waters". বাকি দ্বীপগুলি দখল করে ফেললেন একে একে। শুধু কাউই দখল করতে বেগ পেতে হল সম্রাট কামেহামেহাকে।

হানা অঞ্চলে পরের দিন প্রথম গন্তব্য ওয়াইনাপানাপা পার্ক। এখানকার কৃষ্ণ বেলাভূমি অর্থাৎ black sand beach প্রখ্যাত। গরম ম্যাগমা ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে ঠান্ডা জলের সংস্পর্শে ছোট্ট ছোট্ট কালো পাথরে পরিণত হয়। তারপর নিরন্তর বাতাসের সাথে ঘর্ষণে ধীরে ধীরে কালো বালিতে পরিণত হয়েছে। সে এক দেখার মত দৃশ্য। একটা লাভা গুহাও আছে। সপরিবারে সেই কালো গহ্বরের মধ্যে ছবি। বেশ ঘন্টা দুয়েক কাটিয়ে কফি ব্রেক নিলাম। সঙ্গে হাওয়াইয়ান পাইনাপেল কুকি আর ম্যাকাডেমিয়া নাটস। চললাম পরবর্তী গন্তব্য থ্রী বিয়ার্স ফলস। এবং সেখান থেকে সেভেন সেক্রেড পুলস যা কিনা হালিয়াকালা ন্যাশনাল পার্ক-এর অন্তর্গত। পাহাড়ি গিরি প্রস্রবণ সাতধারায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রকে ছুঁয়েছে এখানে। চোখের কাজলে সে দৃশ্য ধরে নিয়ে আমরা শুরু করলাম ট্রেকিং। গন্তব্য ব্যাম্বু ফরেস্ট। ট্রেকিং রুটটা বড়ই মনোরম। দুদিকে ঘন অরণ্য। গাছেদের পাতায় পাতায় আকাশ অদৃশ্য। কোথাও বা পাহাড়ি ঝর্ণার ঝিরিঝিরি শব্দ, কোথাও বা ভিজে থাকা মাটি। বুনো গন্ধ। পাখিদের কুজন কাকলি। মাঝখানে আবার একটা বিরাট বটবৃক্ষ পাওয়া গেল যার ঝুরি নেমেছে বিশাল জায়গা জুড়ে। দুটো সিকি পয়সা (পড়ুন সানাই তাথৈ) নিয়ে দ্রুত পাহাড়ে চড়া যায় না। সন্ধে নেমে আসছিল বলে ব্যাম্বু ফরেস্ট অব্দি ট্রেকিং সম্পূর্ণ না করেই আমাদের ফিরতি পথ ধরতে হল। ফেরার রাস্তা খুব দুর্গম। বিকেল থাকতে থাকতেই বাড়ি পৌঁছতে পারলে ভাল। হানাতে আমাদের আবাসস্থলে যখন পৌঁছলাম তখন ঘন অন্ধকার। ও হ্যাঁ, সকালে আমরা এক রাউন্ড ওয়ার্নিং পেয়ে গেছি। বাড়ির মালকিনের কাছে। তাথৈয়ের দাক্ষিণ্যে। হানা নাকি রাত আটটা থেকে সকাল আটটা অব্দি quite zone অর্থাৎ কিনা জোরে শব্দ করা যায় না। আর আজ সকালেই সাতটা নাগাদ

আমার ছোটো মেয়ে কি এক অকারণে বিরক্ত হয়ে তার রত্নসম্ভবা গলা ফাটিয়ে কেঁদে নিজের উপস্থিতি সারা হানাকে জানান দিয়েছিল। তাই ফোনে করে ল্যান্ডলর্ড বলে দিয়েছে নৈব নৈব চ। তাই তাড়াতাড়ি দুটোকে ডিনার করিয়ে ঘুমোতে পাঠালাম।

গুপ্তচর, কি সংবাদ নিয়ে এসেছ? কাউই-এর আলি নুই কাউমুয়ালি-এর সৈন্য ও অস্ত্র বল কেমন দেখলে ?

মহারাজ কামেহামেহার জয় হোক। খবর সবই আশাজনক। কিন্তু শুধু একটা ব্যাপারেই ...

বলো বলো। ওদের সৈন্য বাহিনী কি ...।

মহারাজ কামেহামেহার সৈন্যদলের ফুত্কারেই ওরা নস্যাৎ হয়ে যাবে। আমাদের অর্ধেক সেনাও ওদের নেই মহারাজ।

উত্তম উত্তম। তবে কি ওদের কামান বা বন্দুক ...

মহারাজের সামনে ওরা নেহাত বর্বর। ওরা এখনো এই সব অত্যাধুনিক আগুন ছোঁড়ার যন্ত্র দেখা তো দূরের কথা, কানেও শোনে নি মাহারাজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

বাহ অতি উত্তম। এই সংবাদ আনয়নের জন্য আমি তোমায় দুই শত স্বর্ণমুদ্রা দেব। দৌবারিক, কোষাধ্যক্ষকে ডাকো। মহারাজ, শুধু একটা ব্যাপারেই ...

কি আবার ব্যাপার ? ওদের না সেনা আছে, না অস্ত্র। আর তাছাড়া তোমরা তো জানোই আমি ঈশ্বরনির্দিষ্ট সারা হাওয়াই-এর একছত্র অধিপতি হওয়ার জন্য।

মহারাজ, কানাঘুষো শুনলাম কাউইরাজ কাউমুয়ালি তন্ত্রমন্ত্র জানেন।

হা হা হা। হাসালে তুমি গুপ্তচর। ঈশ্বর আমার সহায়। কাউমুয়ালি কালাযাদু করে আমার কিছুই বিগড়োতে পারবে না।

কিন্তু মহারাজ, অধমের ধৃষ্টতা মাপ করবেন। বছর কয়েক আগে আপনি কাউই আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

ব্যর্থ হয়েছিলাম, হ্যাঁ আমি ব্যার্থ হয়েছিলাম, সেনাবাহিনীর অন্তর্কলহের জন্য। কিন্তু এবারে তেমনটা হবে না। এবারে আমার সৈন্য সংখ্যা দশ হাজার। আগের বারের দ্বিগুণ। আর সঙ্গে আছে সেই আগুন ছোঁড়ার যন্ত্র, কামান। কাউই দখল এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তুমি এখন এসো ...

মহারাজ-এর জয় সুনিশ্চিত। সম্রাট কামেহামেহার জয় হোক। ওয়াহু বন্দর থেকে কাউই-এর উদ্দেশে বেরোনোর কয়েক দিনের মাথাতেই অদ্ভুত সংক্রামক রোগের কবলে পড়লেন কামেহামেহা ও তার সৈন্যদল। প্রতিদিন শয়ে শয়ে সৈন্য মারা যেতে লাগলো। মহারাজ নিজেই এত দুর্বল যে প্রাণ যায় যায়। দ্রুতগামী যে নৌকো আগেই কাউই-এর উদ্দেশে গেছিল সংবাদ সংগ্রহ করতে, ফিরে এসে জানান দিল রাজা কাউমুয়ালি নাকি যুদ্ধদেবতাকে তুষ্ট করার জন্য ভয়ঙ্কর সব তান্ত্রিক ক্রিয়া করছেন। তিনজন সমর্থ যুবককে বলি চড়ানো হয়েছে। এই ভয়ানক মারণ রোগ সেইসব যাদুবিদ্যারই ফল, তাতে আর সন্দেহ কি? ফিরে চলল সৈন্য বাহিনী। মহারাজ মরতে মরতে প্রাণে বেঁচে গেলেন কোনমতে। কাউই দখলের স্বপ্ন তার এবারেও অপূর্ণ রইলো।

ঈশ্বরীয় শক্তিকে ঈশ্বরীয় শক্তি দিয়েই মোকাবিলা করতে হবে দৃঢ় বিশ্বাস সম্রাটের। তিনি যুদ্ধ দেবতা কুকার পূজার্থে মন্দির নির্মাণ করলেন। অবশ্য শেষমেশ আলি নুই কাউমুয়ালিও বুঝতে পারছিলেন বেশিদিন কামেহামেহার হাত থেকে

কাউইকে বাঁচিয়ে রাখা যাব না। তাই তিনি কামেহামেহার কাছে বিনা রক্তপাতে নতিস্বীকার করেছিলেন কয়েক বছর পর। কাউই পরিণত হল কামেহামেহার করদরাজ্যে। সমগ্র হাওয়াই-এর একছত্র অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন তার পূর্ণ হয়েছিল। তিনিই প্রথম এই অসম্ভবকে সম্ভব করেন। সব দ্বীপে one nation one rule প্রবর্তন করেছিলেন সম্রাট কামেহামেহা যাতে তাঁর মৃত্যুর পরেও দ্বীপগুলি এক ছাতার তলায় থাকে।

পরের দিন ফেরা হানা থেকে। মাউই-এর বীচ সাইডে আমাদের রিসর্ট কিহেই শহরে। ফেরার পথে একটি ছোট্ট দোকান থেকে সুন্দর একটা কোরাল আর একটা শঙ্খ কেনা হল। শঙ্খটি বাজিয়েও দেখিয়ে দিলেন বিক্রেতা ভদ্রলোক। শাঁখ আমি কোনকালে বাজাতে পারি না। নোট ডাউন করলাম এবারে ফিরে গিয়ে শাঁখ বাজানোটা শিখে ফেলতে হবে। শিখেছিলাম শিকাগো ফিরে। সে যাই হোক। বিক্রেতা ভদ্রলোকের নাম জন। গল্প করে বললেন, তিনি নিজেই সমুদ্রে ডুব দিয়ে এইসব সামুদ্রিক জিনিসগুলি তুলে আনেন। সমুদ্দুরকে ভালবেসে আর বিয়ে থা করেন নি। প্রথমবার আমেরিকান মেনল্যান্ড থেকে মাউই এসেছিলেন কিশোর বয়সে। নেশা লেগেছিল তখনই। সমুদ্রের গভীরে ডুব দেওয়ার নেশা। Deep sea diving। তারপর একদিন সব ছেড়েছুড়ে চলে এসেছেন এই দ্বীপে। তা সে কত বছর আগে তার মনে পড়ে না। ডুবুরি কিন্তু পাক্কা দোকানদার। একটি ল্যাপিজ লাজুলি দেওয়া আংটি আমার স্ত্রী আঙুলে পরে নিতেই বলে দিলেন, এমনটা সুন্দর নাকি আর কোনো আঙুলে দেখায় না। অতএব সেই লাজুলি লাজুক মুখ করে সেই আঙুলেই রয়ে গেল। দোকানে ফিরে গেল না। পরের দিন আমাদের বিবাহ বার্ষিকী। সেই উপলক্ষে আংটিটি উপহার স্বরূপ দিয়ে ফেললাম স্ত্রীকে। পকেট খালি করে। দুপুর বেলা পায়াতে সামুদ্রিক মাছ সহযোগে মধ্যাহ্নভোজনটা তা যা হোক মন্দ হল না। রসনাতৃপ্ত করে কিহেইতে আমাদের রিসর্ট-এ চেক ইন করতে করতে সন্ধ্যে প্রায় নামে নামে।

ক্যাপ্টেন জেমস কুক তিন নম্বর সমুদ্র অভিযানে বেরিয়েছেন এবার। সন ১৭৭৬। জাহাজের নাম এইচ এম এস রেজলিউশান। প্রথম অভিযানে তিনি তাহিতি হয়ে নিউজিল্যান্ড আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয় অভিযানে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন এবং আন্টার্কটিক সার্কেলকে নৌপথে পার করেছেন যা তাঁর আগে কেউ করতে পারে নি। সমুদ্র অভিযান এবং নতুন ল্যান্ড আবিষ্কার করার মাপকাঠিতে ক্যাপ্টেন জেমস কুকের থেকে উজ্জ্বল কৃতী বোধ হয় আর কেউ নেই। এইবারে তিনি বেরিয়েছেন আমেরিকার উত্তরে northwest passage আবিষ্কার করতে। কিন্তু পথে শষ্যশ্যামলা কাউইকে দেখতে পেয়ে কিছুদিনের বিনোদ যাপনে নোঙর করলেন ওয়াইমিয়া বন্দরে। হাওয়াইয়ানদের সেই প্রথম ইউরোপিয়ান দর্শন। শ্বেতাঙ্গ, দীর্ঘদেহী ইউরোপিয়ানদের দেখে দেবতা ঠাউরালেন তারা। এমন অদ্ভুত বিশাল জাহাজ কি মানুষের তৈরী হতে পারে? আর জাহাজের খোল? সে তো কাঠের থেকে অনেক গুণ কঠিন। আয়রন নামক কি এক ধাতু দিয়ে নাকি তৈরী। কই এমন ধাতুর কথা তো তারা কখনো শোনে নি! সারা পৃথিবীতে কোথাও এ জিনিস পাওয়া যায় বলে জানা নেই। এ নিশ্চয়ই স্বর্গভূমির জাহাজ। ক্যাপটেন কুক-এর মুখটা একদম দেবতা লোনোর মত না ? হ্যাঁ অবিকল। ইনি দেবতা লোনো না হয়ে যান না। ইউরোপিয়ানরা পেলেন দেবতাদের মত আদরযত্ন ও খাতির। হাওয়াইয়ান মেয়েরা শয্যাসঙ্গিনী হল অবাধে। যৌন মিলনে কাপু নেই হাওয়াইতে। ইউরোপীয়ানরা ভুল বুঝল যে এখানকার মেয়েরা সহজলভ্য। কিন্তু তা না। অতিথিকে আপ্যায়ন করতে তাঁকে শয্যাসঙ্গ দেওয়া কিছু অসঙ্গত নয় সেখানে। কয়েক মাস বেশ মজায় কাটিয়ে কুক আবার গেলেন নর্থ ওয়েস্ট প্যাসেজের সন্ধানে। বছর ঘুরতে ফিরলেন যখন নোঙর করলেন কিয়ালাকেউয়া উপসাগরে যা কিনা দেবতা লোনোর বাসস্থান বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস। আর সময়টাও লোনোর বাৎসরিক পুজোর সময়। অতএব কুক ও তাঁর সঙ্গী নাবিকরা আবারও প্রথম প্রথম পেলেন দেবতাদের ন্যায় খাতির। কিন্তু এবারে আর আদর সইল না ভাগ্যে বেশিদিন। যেদিন বন্দর অঞ্চলে তার দলের একজন নাবিক মারা গেল সন্দেহের বীজ বপন হল। দেবতারা তো অমর। কিন্তু এরা তো নেহাত মরণশীল। এরা তো দেবতা নয়। তার উপরে কোনো কোনো দুর্বিনীত নাবিক দুর্ব্যবহার করেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে। পরিস্থিতি বিষিয়ে উঠছে দেখে ক্যাপ্টেন কুক ফিরতি পথ ধরলেন। কিন্তু নিয়তি তখন অন্য কিছু লিখছিল মানবজাতির মহা উপন্যাসে। সামুদ্রিক ঝঞ্ঝায় এইচ এম এস রেজলিউশান ক্ষতিগ্রস্ত হল সফর শুরু করার কদিনের মধ্যেই। ফিরে আসতে হল সেই কিয়ালাকেউয়া উপসাগরেই। এইবারে কিন্তু ইঁট পাটকেল ছুঁড়লো হাওয়াইয়ান আদি বাসিন্দারা। কোনমতে

জাহাজ মেরামত করে বেরিয়ে যাবেন কুকের এমনই ইচ্ছে। কিন্তু উত্তেজনা দিন দিন বাড়তে লাগলো। হাওয়াইয়ানরা চুরি করল জাহাজের লাগোয়া একটি কাটার ভেসেল বা নৌকো। সেটা ফিরে পেতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও নিজের সামরিক শক্তিতে পূর্ণবিশ্বাসী কুক সিদ্ধান্ত নিলেন হাওয়াই-এর তৎকালীন আলি নুইকেই বন্দি করে মুক্তিপণ হিসেবে নৌকো ফেরত চাইবেন। ছোটখাটো সংঘর্ষে এক মধ্য স্তরের হাওয়াইয়ান প্রধান গুলি খেয়ে প্রাণ হারালেন। ব্যাস শুরু হয়ে গেল পুরো দমে যুদ্ধ। ইউরোপিয়ানদের ফায়ার পাওয়ারকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে ডিঙ্গি নৌকোতে করে জাহাজে উঠে এল শয়ে শয়ে হাওয়াইয়ান। তারা অকুতোভয়। আর হবে নাই বা কেন? নেতৃত্ব দিচ্ছে যে সেই কিশোর কামেহামেহা যার শরীরে কিনা শত হস্তির শক্তি, যে কিনা ভবিষ্যতে সমস্ত হাওয়াইকে এক ছাতার তলায় আনবে। ক্যাপ্টেন কুক-এর পথ রোধ করে দাঁড়াল সেই কালান্তক যম। কামেহামেহা। হাতাহাতি যুদ্ধে প্রাণ হারালেন ক্যাপ্টেন কুক।

জাহাজ কিন্তু ফিরে যায় এবং তারপর থেকে মাঝে মাঝে বিদেশিরা ক্রমাগত আসতে থাকে হাওয়াইতে। তাদের কাছ থেকেই কামান ও গোলাগুলি সংগ্রহ করে সব কটি দ্বীপের ওপর আধিপত্য স্থাপন করেন কামেহামেহা পরবর্তী কালে। ইউরোপিয়ানদের সাথে সংযোগে হাওয়াই ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে।

পরের দিনটিই আমাদের বিবাহ বার্ষিকী। একটি পেশাদার ফটোগ্রাফের-এর সঙ্গে কথা হয়েছিল আগে থেকেই। কালেপোলেপো একটি নয়নাভিরাম কিহেই বীচ। সেখানে গিয়ে family photography করা হল ঘুম থেকে উঠে না উঠেই। খুব খানিক পোজ মারলাম শাহরুখ খান স্টাইলে। Photography শেষ হয়ে গেল কিন্তু পুরো ট্রিপে প্রথমবার বালিতে নামতে পেরে মেয়েদের আশ আর মেটে না। যখন ফাইনালি "এবার ফিরতে হবে" বলে হাঁক ছাড়লাম, সানাই সোজা শুয়েই পড়লো বালিতে। সারা অঙ্গের সঙ্গে এখন মাথার চুলেও বালি। বাধ্যতামূলক বকাঝকা করে সর্ব অঙ্গের বালি তার পরিস্কার করে হোটেলে ফিরলাম। জামা প্যান্ট বদলে ছুটলাম হালিয়াকালা আগ্নেয়গিরির সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উদ্দেশে। ফুড ট্রাক থেকে খাবার তুলে নিয়ে সোজা চলে গেলাম ইয়াও ভ্যালী দেখতে। এখানেই কামেহামেহা battle of dammed waters-এ রক্তে লাল করে মাউই দখল করেন। কি কারণে ভ্যালিটি বন্ধ ছিল। কিন্তু পাশেই একটি মনোরম কোরিয়ান স্টাইল পার্ক। সেখানে বসে পেট বাবাজীবনকে তুষ্ট করে চললাম আবার চললাম হালিয়াকালার উদ্দেশে। পথে পড়লো ছোট্ট কুলা গ্রাম। বাথরুম ব্রেক নিতে গিয়ে দোকানে চোখে পড়লো পাহাড়ি ফুলের অদ্ভুত সুন্দর বোকে। ফুলের নাম জানি না। তবে এমন ফুল আমাদের সমতলের শহরের দোকানে কখনো দেখিনি। বিবাহ বার্ষিকীর দিন বলে কথা। বোকেটি কিনে সঙ্গিনীটিকে উপহার দিয়ে তার একটি হাসি অর্জন করা গেল। এর পর থেকে পাহাড়ি পাকদণ্ডী বেয়ে গাড়ি করে শুধু ওঠা আর ওঠা। খুব সতর্ক হয়ে চালাতে হয়। নয়তো খাদে। হালিয়াকালা আসলে একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। যত ওপরে যাওয়া হল, তত বৃক্ষগুলি ধীরে ধীরে গুল্ম ও কাঁটা জাতীয় গাছে বদলে গেল। একদম চূড়ায় যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন সূর্যাস্ত হতে কিছু বাকি। এই হালিয়াকালাতে অনেকে সূর্যোদয় দেখতে আসে। কিন্তু খুব ভিড় হয় বলে আগে থেকে বুক করতে হয়। কিহেই থেকে এখানে সূর্যোদয় দেখতে আসতে হলে ভোর চারটেতে বেরোতে হয়। ছোট দুটো হ্যাঙ্গামাচরণ আর ঝামেলচরণকে নিয়ে অত ভোর বেলা বের হব না বলেই আমরা সূর্যাস্ত দেখতে এসেছি হালিয়াকালাতে। শুধু একটাই ঘোরতর মুস্কিল। সব ট্যুর গাইডে এবং লোকমুখে শোনা ছিল যে হালিয়াকালার দশ হাজার ফুট উচ্চতায় তাপমান অনেক কম। হাওয়া দিলে feels like temperature প্রায় শূন্যর কাছাকাছি। এদিকে চিরবসন্তের দেশে পৌঁছে অব্দি আমরা গরম জামা ক্যারি করতে ভুলেছি। আর স্ত্রী তো আমাদের বিবাহবার্ষিকীর দিনে মনের দিক থেকে সপ্তম স্বর্গে বাস করছে। অতএব, আরে মাইলা, যা ভুলা। গাড়ির ট্রাঙ্ক খুঁজে দুটো পাতলা হুডি পাওয়া গেল। নেহাত পাতলা। এই পরেই কাজ চালাতে হবে। সেটাই পরে প্রবল ঠান্ডার সঙ্গে লড়াই করে পালা করে গাড়ি থেকে নেমে হালিয়াকালার চুড়োতে কাচের ঘর থেকে দেখলাম সমগ্র মাউইকে। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই সূর্য ঢলে পড়লো পশ্চিমকোলে। লাল আবির মুঠো মুঠো ছড়িয়ে পড়লো হালিয়াকালার কৃষ্ণ অঙ্গে। সেই দৃশ্যকে ভিডিওতে বন্দী করে কাঁপতে কাঁপতে যখন গাড়িতে উঠলাম হাতের জায়াগায় হাত ছিল কিনা বুঝতে পারছিলাম না। যাই হোক গাড়ির গরমে হাতে সম্বিত ফিরতেই আবার আমাদের গাড়ি চালালাম পাহাড় বেয়ে নিচে। অ্যানিভার্সারি ডিনার? মুলতুবি থাক পরের দিনের জন্য। বাড়ি ফিরতে ফিরতেই ছোট দুজন ঘুমের রাজ্যে। পরের দিন আবার ভোর বেলা বেরোন।

পরের দিন বুক করা ছিল একটা স্নরকেলিং ট্যুর। মাউইতে আসব একটা ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি করব না তা কি হয়? স্নরকেলিং মাস্ক মুখে পরে চোখ জলের নিচে ডোবালেই সমুদ্রের নিচে রঙিন মাছেদের খেলা দেখা যায় আর অদ্ভুত সুন্দর সব কোরালস। আমাদের ছোট্ট ষ্টীমার চলল মোলোকিনি বে-র উদ্দেশে। এক ঘন্টার মত যাবে সমুদ্রবক্ষে। কোরাল ও মাছের প্রাচুর্যের জন্য মোলোকিনি বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু অভিজ্ঞতা তেমন সুখকর হল না এ যাত্রা। কারণ সমুদ্র পীড়া। প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। Bumpy water। কিছুক্ষণ পর থেকেই তাথৈ-এর মিটার ডাউন। শুয়ে পড়ল কোলে। আমাদেরও মিটার হাফ ডাউন। পেটের মধ্যে ব্রেকফাস্টের কেক যেন কিলবিলিয়ে উঠছে। খানিক পরে পিপি করবার জন্য স্টীমারের ছাদ থেকে এক তলায় নামতেই তাথৈ বমি করা শুরু করল স্টিমার-এর মেঝেতেই। কোন পূর্ব ইঙ্গিত দেয় নি যে বমি করবে। তাই বারে বারে নিজেকে দুঃখিত বলা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। বমি আমারও যে পাচ্ছিল না তা নয়। তাথৈকে নিয়ে স্টিমার-এর রেলিং-এর গা ঘেঁষে বসে রইলাম। পরের বার নিজের বা মেয়ের বমি হলে যাতে বাইরে করতে পারি। আমরা একা নই। এক আমেরিকান অনেক বমি টমি করে একটি বালিশ সহযোগে ওই রেলিঙের পাশেই সেই যে চোখ বন্ধ করলেন, এ নিদ্রা তার শেষ নিদ্রাও হতে পারে মনে হল। স্নরকেলিং করা দূরের কথা ষ্টীমার ফিরে আসা অব্দি তিনি চোখ খোলেন নি। ষ্টীমার মোলোকিনি পৌঁছল যখন তখন ধরাচুড়ো পড়ে জলে নেমে খানিক স্বস্তি পেলাম। কিন্তু এবার আবার আমার স্ত্রী-এর পালা। সেও আমার কন্যার পথের অনুগামিনী হয়ে বমি করল। যাক। কি আর করা? শুনেছিলাম যাওয়ার বা ফেরার পথে ডলফিন বা তিমি মাছের দর্শন মিলতে পারে। জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ টেরিয়ে গেল, তেনারা কৃপা করলেন না মোটেই। তবু স্থলের প্রাণী স্থলে নেমে যেন স্বস্তি পেলাম।

দু-দুটো আইল্যান্ড এতদিন ধরে ঘুরছি। এখনও একদিন পুরোপুরি বীচ ডে কাটানো হয় নি। মেয়েরা বালি ঘাঁটতে না পেরে এতদিনে নিতান্ত বিরক্ত। মাউই-এর চারপাশেই সমুদ্র সৈকত। কামাওলে বীচে নেমে শুরু করলাম আমাদের সেই ছোটবেলার পুরী টাইপ অ্যাক্টিভিটি। অর্থাৎ মাঝে মাঝে সমুদ্রস্নান আর মাঝে মাঝে বীচে বসে ছোটগুলোর সঙ্গে বালি নিয়ে খেলা। দুর্গ, পরিখা, ক্যানাল ইত্যাদি বানানো। সন্ধে হতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে হোটেলে প্রত্যাবর্তন। অ্যানিভার্সারি ডিনার আজকেও মুলতুবি। অতএব বুঝতেই পারছেন সন্ধের দাম্পত্য বাক্যালাপ তেমন সুখকর হল না। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সব কি হয়, মিনমিন করলাম। পরের দিন শেষ দিন আমরা সারাদিন পেট জিনিসটার ওপরেই প্রধান ফোকাস করব এই বলে হের হাইনেস ওরফে হোম মিনিস্টার ওরফে বাড়ির সম্রাজ্ঞীকে শান্ত করলাম।

সম্রাজ্ঞী কাহুমানু তার বিলাসবহুল মহলের গবাক্ষের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন, এই যে কাপু, এর সত্যি কি কোনো প্রয়োজন আছে? নাকি এ পুরুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি? হ্যাঁ এ কথা তিনি জানেন যে, প্রতিটা মানুষের মধ্যে আছে মানা বা যাকে বলে তার চিৎশক্তি। সম্রাট কামেহামেহা গত হয়েছেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রানী কাহুমানুর খুব মনে পড়ে স্বামী কামেহামেহার কথা। কামেহামেহার ছিল অপ্রতুল মানা। একজন সাধারণ হাওয়াইয়ানেরও মানা থাকে, তবে অল্প। কাপুর বিরুদ্ধে যাওয়া মানে আধ্যাত্মশক্তি ক্ষয় করা যার ফলে পরিবার পরিজন প্রতিবেশীদেরও মানা ক্ষয় পায়। তাই কাপুর বিরুদ্ধে যাওয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সবই ঠিক আছে, রাণী কাহুমানু ভাবছিলেন, তবে কাপু নির্দেশাবলিতে এত লিঙ্গবিদ্বেষ কেন? কেন আমি কোনো পুরুষের সাথে বসে খেতে পারব না? কেন আমি টাড়ো, কলা, শুয়োরের মাংস খেতে পারব না? পুরুষ কোন অধিকারে নারীর তুলনায় বেশি সুবিধা ভোগ করবে? কেন? কেন? কই? এই যে বিদেশি গোরা লোকগুলো আসছে, তারা তো এই সব কাপু মানে না। কই তাদের তো মানা কমছে না, কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। উত্তপ্ত রক্ত প্রবাহ চলতে থাকে সম্রাজ্ঞী কাহুমানুর মাথায়। এ প্রথা রদ করতে হবে।

সম্রাট কামেহামেহা মারা যাওয়ার পর থেকে রাজা হয়েছে লিহো লিহো কিন্তু সে এখনো নেহাত অর্বাচীন। বিমাতা এবং রাজ্যের সর্বেসর্বা কাহুমানুর মুখের ওপর কথা বলার সাহস তার হয় না। মহারাণী কাহুমানু একদিন আলি নুই লিহোলিহো এবং তার মা তথা নিজের বোন কেউপুওলানি এবং প্রধান পুরহিত হেওয়াহেওয়ার সাথে বসে নৈশাহার করলেন যা কিনা কোনো মেয়ে কোনোদিন করে নি হাওয়াইতে, যা কিনা গে ছিল কাপু। সমস্ত রাজ্যে ঢেড়া পিটিয়ে দেওয়া হল যে আজ থেকে কাপু প্রথা রদ হল।

এই ঘটনার কিছু পরেই, যখন সমস্ত হাওয়াইবাসী নিজেদের পূর্বজদের নিয়ম কানুন, এমন কি ঠাকুর দেবতাদের সন্দেহ করতে শুরু করল, ঠিক তেমনই একটা অস্থির সময়ে হাওয়াই-এর মাটিতে নামলো খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা। যিশুর ক্ষমাশীল মূর্তি এবং সুসভ্য ইউরোপিয়ানদের বৈভব ইত্যাদি সাধারণ মানুষদের আকৃষ্ট করল। রাজা থেকে প্রজা জনে জনে গ্রহণ করছিলো খ্রিস্টধর্ম। খ্রিস্টধর্মের প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ছিল সমানুপাতিক ভাবে। আর এ ছাড়া ইউরোপিয়ানরা নিয়ে এসেছিল অনেক রকম সংক্রামক রোগ, কুষ্ঠ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, কলেরা ইত্যাদি। হাওয়াইয়ানদের জৈব প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখে নি এইসব ভাইরাস। ধর্মযাজকরা আসার পর থেকে সংক্রামক রোগ আরও বাড়ল। মহামারীতে মারা গেল শত সহস্র লোক। ক্যাপ্টেন কুক আসার সময়ে যেখানে যে হাওয়াইয়ান জনসমষ্টি ছিল তিন লাখের কাছাকাছি, তা কমতে কমতে দাঁড়াল দেড় লাখে। পরে কমে হয় চল্লিশ হাজার। এছাড়া চিনি শিল্প বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে অনেক বিদেশি শ্রমিক, প্রধানত চিন দেশীয় লোকজন, হাওয়াইতে আমদানি হতে থাকে। বিশ্বায়নের ছোঁয়া লেগে হাওয়াইএর নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগলো। অবশেষে ১৮৯৮ তে হাওয়াইকে আমেরিকার অংশ হিসেবে ঘোষণা করল প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলি। ১৯৫৯ সালে হাওয়াই হয়ে যায় আমেরিকার একটি রাজ্য।

যেমন কথা তেমন কাজ। আজকের সারাদিনের ফোকাস হাওয়াই-এর খাবার। সঙ্গিনীর মুখে হাসি ফোটাতে ঘুম থেকে উঠেই সোজা চলে গেলাম মাউই-এর পশ্চিম দিকের শহর লাহাইনাতে একটা ব্রেকফাস্ট প্লেসে। প্রাতরাশেই ওমলেট, ব্যাগেল, ফ্রেঞ্চ টোস্ট, হাওয়াইয়ান ককটেল সহযোগে মাথা থেকে টেল অব্দি ভরে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাওয়া গেল লাহাইনার একটা পুরোনো মার্কেট প্লেসে। সেখানে প্রাচীন ধরনের লুক অ্যান্ড ফীল। হরেক রকম দোকানে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন সামুদ্রিক জিনিস। আমরা আবার একটা আনারস দোকানে ঢুকে নিয়ে নিলাম একটা পাইনাপেল জুস আর মশলা দেওয়া কাটা আনারস। সার্ভ করছে সেই কাটা আনারসের ওপরেই সুন্দর করে সাজিয়ে। দেখা হল একটা হাওয়াইয়ান আর্ট গ্যালারী। সারা দেওয়াল জুড়ে বিশাল বড় লাইফসাইজ একটা অলীক সামুদ্রিক দৃশ্যের photography দেখে প্রাইস ট্যাগটা চেক করলাম, মাত্র পনের হাজার ডলার!! পালাও পালাও। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পৌছে গেলাম একটা বিশাল বটগাছের সামনে। বাপরে সে কি বিশাল বট গাছ। শুরু শেষ নেই। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন ছাড়া এত বড় বট গাছ দেখিনি। অতএব সবজান্তা গুগল-এর শরণাপন্ন হতে হল। গুগল জানাল এটা ইউ এস এর বৃহত্তম ও প্রাচীনতম বটগাছ। বয়স লগবগ দেড়শো বছর। ছড়িয়ে আছে তিন একর জমির ওপর। আজ্ঞে হ্যাঁ তিন একর! বটের ছায়ায় বেশ কিছু কাল অতিবাহন করা গেল। অনেক বেঞ্চ পাতা আছে বটের তলায়। বটের প্রাচীন স্নিগ্ধ ছায়ায় সেখানে গার্ল ফ্রেন্ড-এর ঠোঁট থেকে রক্তিম শুষে নিচ্ছে তার বয়ফ্রেন্ডের অতৃপ্ত অধর।

এইখান থেকে বেরিয়ে আমাদের পরের গন্তব্য কাপালুয়া বে। পড়াশুনো করে এসেছিলাম এই বীচেই দারুণ স্নরকেলিং করা যায়। গতকালের স্নরকেলিং-এর অভিজ্ঞতা তিক্ত। আমি একটু আধটু করে থাকলেও আমার স্ত্রী একটুও করতে পারে নি। বমি করে করেই সার হয়েছে। এ যাত্রায় স্নরকেলিং বা বাদ থাকে কেন? হাওয়াই নিরাশ করে না। আসলে স্টিমারে করে মাঝ সমুদ্রে যাওয়ার দরকারই হয় না এখানে রঙিন মাছেদের দেখতে। আমরা স্নরকেলিং সামগ্রী গাড়িতেই ক্যারি করছিলাম। সোজা নেমে পড়লাম। বাচ্চারা যখন বালি নিয়ে খেলছে আমি আর আমার স্ত্রী পালা করে করে সমুদ্র মুখোশ পরে জলের নিচে চোখ রাখছি। সে কত রকমের মাছ তার কথা আর কি বলি? আমি মৎস্যবিশারদ নই। সেই সব লাল, নীল, ডোরাকাটা, মসৃণ, তেচোখা, শিংওলা সব মাছেদের নাম আমার জানা নেই কিন্তু সে বড় শান্ত ও নিস্তব্ধ জগৎ। স্নরকেলিংটা ঠিকঠাক আয়ত্ত করতে পারার পর থেকেই সাহস বাড়ছিল। কেমন নেশাও যেন লেগে গেল। চিন্তাপ্রবাহ, আমি বোধ, ইন্দ্রিয়বাহিত অনুভূতি সকল সব যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। যেন ঐ মাছেরা আমায় কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে যেখানে শব্দের আর আলোর প্রবেশাধিকার নেই। আমার মানা যেন এখন তাদের অধিকারে। আমি কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নই। এক অবিভক্ত পূর্ণর একটা অংশ মাত্র। একেই কি সমাধি বলে? ওই বিরাট মাছটা, ওটা কি কামেহামেহা? আর পাশে পাশে যে ঘুরছে সে কি রাণী কাহুমানু? আর ওইটা ছোট্ট সুন্দর নীল মাছটা, ওটা কি নাউপাকা? ঘোর লেগে গেছিল চোখে। সেই মায়াবি জগৎ কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে মনে ছিল না। সম্বিত ফিরতে লক্ষ করলাম আমি গভীর জলে। নিচে অন্তত ছ মানুষ

জল। দাঁড়ানো যাবে না আর এদিকে মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় মাস্কে ঢুকে গেছে জল। মাস্ক পরে শ্বাস আর নেওয়া যাচ্ছে না। কোনোমতে মাস্ক খুলে সাঁতার শুরু করলাম তীর লক্ষ করে। উফ অনেকটা দূর। যেতে পারব তো? কোনো লাইফ গার্ড নেই এখানে। কি হবে? নোনা জল গিলছি মুহূর্তে মুহূর্তে। হাঁসফাস করছি। একবার সানাইকে দেখতে পেলাম নিশ্চিন্তে খেলছে ওই দূরে। আবার জলের তলায় ডুবে গেলাম। হারিয়ে ফেললাম। কেউ কি জানতে পারবে আমি ডুবে গেলে? চেঁচাব কি হেল্প হেল্প বলে? খানিক অন্তর পা পাওয়ার চেষ্টা করছি। না এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। আরও সাঁতার টানতে হবে। হাত ধরে আসছে। আর বুঝি পারব না। হঠাৎ পা নামাতেই একটা একটু উঁচু পাথরে বুড়ো আঙুল ছোঁয়াতে পারলাম। কিন্তু জলের ঢেউতে পাথরটা যেন পা থেকে ছেড়ে যাচ্ছে। আবার এক মানুষ জল। আবার ডুবে যাচ্ছি। আবার সাঁতার টানা। কোনমতে এসে পৌঁছলাম তীরের কাছে অগভীর জলে। খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কে টেনে নিয়ে গেছিল এই গভীর জলে? শুনেছি জলের মধ্যে মায়াপরীরা থাকে। কেউ কাছে আসলে তাকে তারা নিজের গভীর বক্ষে চিরশান্তির শয়ান দিতে চায়। সন্ধ্যে নামার আগেই বীচ থেকে হোটেলে ফিরলাম।

শেষ সন্ধ্যা। এদিকে anniversary dinner এখনও হয় নি। বাকি থাকে কেন? ভাল একটা রেস্তোরা খুঁজে নৈশাহার করা গেল। ডিনার করতে করতে ভাবছিলাম দুপুরের স্নরকেলিং-এর কথা। অভিজ্ঞতাটাকে দেখছিলাম একটা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। সংসার সমুদ্রে স্নরকেলিং স্টাইলে ওপর ওপর ভেসে থাকলেই সুখ। ডুব দিলেই আঁকুপাঁকু। যাকগে যাক। পরের দিন ভোর বেলা ডানা মেলে দেব আমার শহর শিকাগোর উদ্দেশে। হাওয়াই বেঁধে ফেলেছিল শত ফাঁদে, তার রূপের ডালি নিয়ে, তার পাহাড়ি উপকথায়, তার জলের গভীরের চুপকথায়, তার ইতিহাসে, তার অনন্য জীবনধারায়। সেইসব মায়াজাল কাটিয়ে ফিরে যাব নাগরিক ক্লান্তিতে। মন ভারাক্রান্ত।

Swarvanu Sanyal — Software engineer living in Naperville, Illinois. I regularly write poems, fictional works like short stories, short plays and non-fictional works like essays in different topics.

জীবনের ক্যানভাসে
সুজয় দত্ত

এক বাক্স চকলেট
সুজয় দত্ত

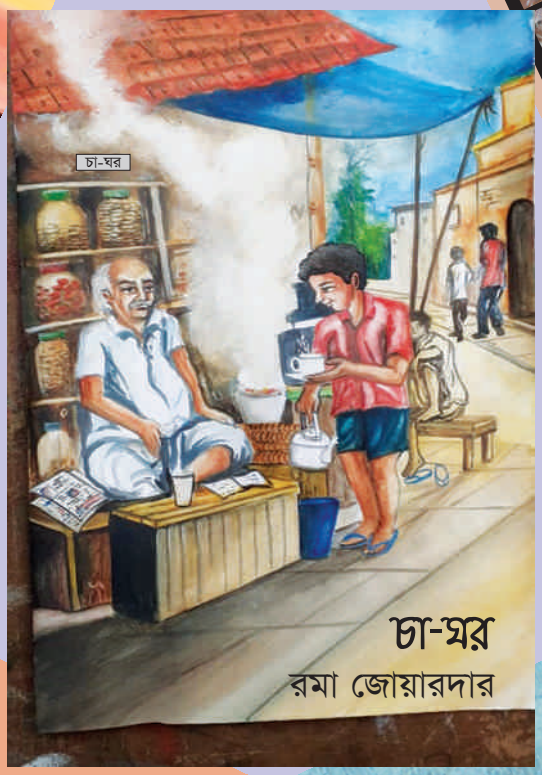

চা-ঘর
চা-ঘর
রমা জোয়ারদার

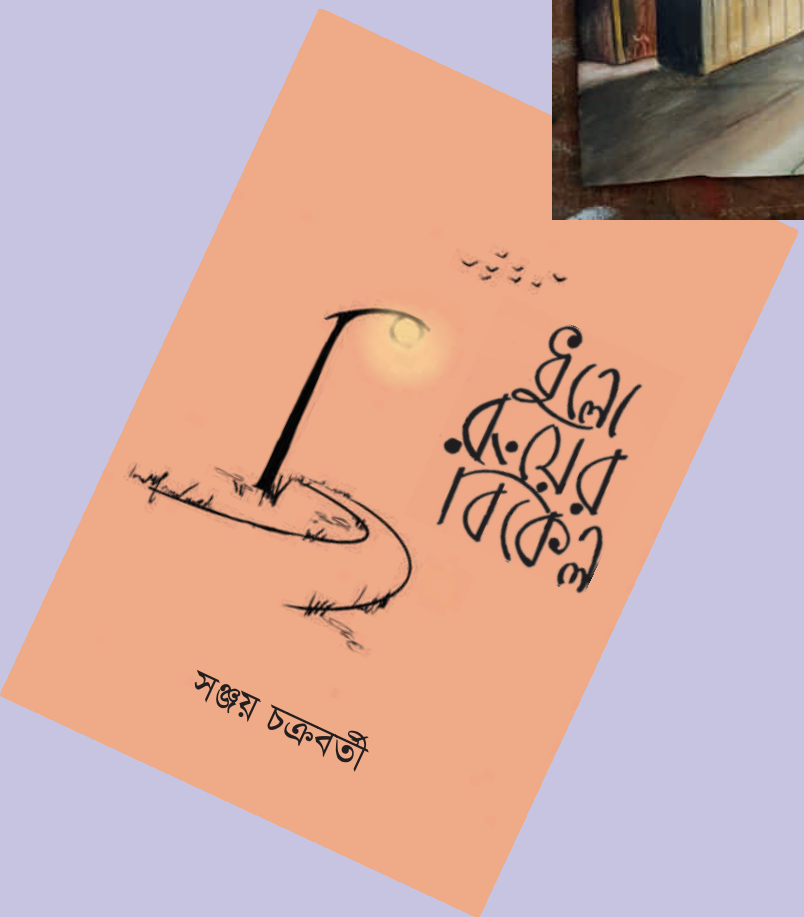

ধুলো
বিকেল
সঞ্জয় চক্রবর্তী

মেঘযাপন
সঞ্জয় চক্রবর্তী